মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

ইসলাম ও আধুনিকতা



Contents

ইসলাম ও আধুনিকতা

মূল
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
(দামাত বারাকাতুহুম)

অনুবাদ
মাওলানা শামসুল আলম
শিক্ষক, জামি'আ শারইয়্যাহ
মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭

সম্পাদনা
মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া
ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, জামি'আ শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭



মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
....
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১৯৯৩ ঈসায়ীর ৩রা নভেম্বরের সেই আলোকোজ্জ্বল সুন্দর সকালটির কথা আমার হৃদয়পটে চিরদিন অম্লান থাকবে। যেদিন "দারুল উলূম করাচীর" মসজিদের আঙ্গিনায় "ইসলামের দৃষ্টিতে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ ব্যবস্থা" শীর্ষক শিক্ষামূলক কোর্স সমাপনকারীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সে অনুষ্ঠানে প্রায় সকল আলোচকই এ যুগের বিস্ময়কর প্রতিভা, বিনয় ও নম্রতার প্রতীক, ইলম ও আমলের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসামনী ছাহেবের প্রসংশা করছিল এবং কেউ কেউ তাঁকে "শাইখুল ইসলাম" বলে আখ্যায়িত করছিল। আর তিনি মাথা নীচু করে বসেছিলেন। এক পর্যায়ে আলোচকদের প্রসংশামূলক কথা-বার্তা যখন তাঁর ধারণায় সীমাতিরিক্ত হয়ে গেল, তখন তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই! এটা কোন প্রসংশা ও গুণ বর্ণনার মজলিস নয়, বরং এখানে আমরা যে বিষয়ে কোর্স করলাম সেটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। কাজেই আমার অনুরোধ, আপনারা আলোচ্য বিষয়ের উপরই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবেন। তাছাড়া অনেকেই আমার নামের সাথে "শাইখুল ইসলাম" শব্দ লাগিয়েছেন, যেটা কোনভাবেই আমার মতো নগণ্যের নামের সাথে লাগানো শোভনীয় নয়। "শাইখুল ইসলাম" এর মতো উচ্চ পর্যায়ের সম্মানসূচক শব্দ আমার নামের সাথে লাগানো "মখমলের কাপড়ে চটের তালী লাগানোর মতোই।"

উপরোক্ত কথাগুলো বলে হযরত যখন আসন গ্রহণ করলেন, তখনই হযরতের বড় ভাই, দারুল উলূম-করাচীর ছদর, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী ছাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) দাঁড়িয়ে বললেন, মাওলানা তাকী উসমানীর নামের সাথে "শাইখুল ইসলাম" শব্দ লাগানো কোন অবস্থাতেই বাড়াবাড়ি বা অতিশয়োক্তি নয়। যিনি আধুনিক মাসয়ালা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে বিশেষত ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছেন, তাঁকে যদি "শাইখুল ইসলাম" বলা না যায় তাহলে কাকে বলা যাবে?

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রফী উসমানী ছাহেবের এ বক্তব্যে হযরত যেন আরো মাটির সাথে মিশে গেলেন এবং হযরতের চক্ষু থেকে দর দর করে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো।

বাস্তবিকই হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব (দাঃ বাঃ) এমন এক বিরল ব্যক্তিত্ব, যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় হয় উম্মতের কল্যাণ কামনায় ও ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজে। হযরতের বক্তব্য ও রচনা সবই মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিরক, কুফর, নিফাক ও কু-সংস্কার নামক মহাব্যাধীর নিখুঁত এক্স-রে রিপোর্ট। সে রিপোর্টে মুসলিম উম্মাহ্র দুর্বলতাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে, সাথে সাথে বিবৃত হয়েছে তার প্রতিকার ও সমাধান। যার উপর আমল করে মুসলিম উম্মাহ তার হারানো সুদিন ফিরিয়ে আনতে পারে।

হযরতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনাসমূহের অন্যতম "ইসলাম ও আধুনিকতা" (اسلام اور جدت پسندی) আধুনিক শিক্ষিত প্রগতিবাদীদের অনেকগুলো মারাত্মক ভুল ধারণার সংশোধনমূলক একটি বিরল রচনা। যার পাঠক মাত্রই উপকৃত হবেন। ইনশাআল্লাহ।

এই সুন্দর রচনাটির অনুবাদের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন তরুন আলেম মাওলানা শামছুল আলম। অনুবাদক নবীন হলেও অনুবাদে তা উপলব্ধি করা যায় না। তাছাড়া বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম ও সাহিত্যিক, মালীবাগ জামেয়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল জনাব মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেবের সম্পাদনার পর বইটি যথার্থই সুন্দর ও সাবলীল হয়েছে। আল্লাহ পাক উভয়কে 'জাযায়ে খায়ের' দান করুন।

আমরা বইটিকে যথাসাধ্য সুন্দর ও নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি তা সত্ত্বেও যদি কোথায়ও কোন অসঙ্গতি কারো দৃষ্টিগোচর হয় অনুগ্রহ পূর্বক আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তি সংস্করণে শুধরে দিবো। ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং সবকিছুকে সর্বাগ্রে দ্বীনের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে গ্রহণ অথবা বর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

১২ রমাযানুল মুবারক
১৪২৩ হিজরী

বিনয়াবনত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পূর্ব কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বর্তমান যুগে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন এবং জীবনের নানা অঙ্গনে উদ্ভূত নতুন সমস্যার ইসলামী সমাধানের ব্যাপারে আমি বিগত ২৩ বছর যাবৎ আমার সাধ্য অনুসারে কিছু না কিছু লিখে আসছি। এগুলোর বেশির ভাগই মাসিক 'আলবালাগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ থেকে ১৫ বছর আগে এই ধরণের বিষয়াবলী নিয়ে 'আছরে হাজের মে ইসলাম কেইসে নাফেয হো' নামে প্রায় সাড়ে সাতশ পৃষ্ঠার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়।

ঐ গ্রন্থ প্রকাশের পরও এই বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আরো বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখার সুযোগ হয়। বন্ধু বান্ধবগণ আগ্রহ প্রকাশ করেন, নতুন নিবন্ধগুলোও ঐ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করে দেয়ার। কিন্তু আমি ভাবলাম, এই প্রবন্ধগুলো যদি ঐ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করা হয় তাহলে গ্রন্থটির কলেরব অনেক বেড়ে যাবে। কলেবর বৃদ্ধির কারণে তা থেকে উপকৃত হওয়াও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধগুলো রাজনীতি, আইন, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, নৈতিকতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত। বিষয়গুলো বিশাল গ্রন্থের অংশ হওয়ায় অসুবিধার একটা দিক হল, যদি কেউ এর একটি মাত্র বিষয়ের প্রবন্ধগুলো পড়ার আগ্রহ রাখেন, তাহলে তাকে পুরো বই কিনতে হবে; যার অনেক প্রবন্ধ তার জন্যে তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

এই কারণে মনে করলাম, বিষয়গুলো একই বইয়ে সংকলিত না-করে প্রত্যেক বিষয়ের উপর পৃথক-পৃথক সংকলন তৈরী করা অধিক সুবিধাজনক হবে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম দিয়ে প্রত্যেকটি শিরোনামের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলো.একত্রিত করে এক একটি বইয়ের রূপ দিয়েছি।

ঐ বিষয়গুলোর মধ্য হতে "ইসলাম আওর জিদ্দাত পছন্দী" (ইসলাম ও আধুনিকতা) শীর্ষক সংকলনটি পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হল। আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, তিনি এটাকে মুসলমানদের জন্যে উপকারী এবং লেখকের জন্য আখিরাতে নাজাতের উসীলা বানান।

মুহাম্মদ তাকী উসমানী
৩রা জিল হজ্জ, ১৪১০ হিঃ

সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ইসলাম ও প্রগতিবাদ	১৩
২.	ইসলাম ও শিল্প বিপ্লব	২৮
৩.	যুগ চাহিদা	৩৫
৪.	ব্যাখ্যার নামে অপব্যাখ্যা	৪৮
৫.	ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা	৫৯
৬.	উলামা ও পোপতন্ত্র	৭০
৭.	বিজ্ঞান ও ইসলাম	৮০
৮.	ইসলাম ও মহাশূন্যাভিযান	৮৪
৯.	ইসলাম ও বিশ্ব জয়	৯৫
১০.	ইজতিহাদ	১০১
১১.	জিহাদ ঃ আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক	১০৯

ইসলাম ও আধুনিকতা

নতুনের প্রতি আকর্ষণ বস্তুতঃ একটি প্রশংসনীয় প্রেরণা এবং মানুষের জন্মগত আকর্ষণ। এই উদ্দীপনা না-থাকলে মানুষ পাথরের যুগ থেকে এ্যাটমের যুগ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হত না। অগ্রসর হতে পারত না, উট ও গরুর গাড়ি থেকে উড়োজাহাজ পর্যন্ত। মাটির প্রদীপ বা মোমবাতির আলো হতে বিজলি বাতি, সার্চ লাইট পর্যন্ত উন্নতি করতে পারত না। এ সবই মানুষের বস্তুগত উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক সাফল্য। এক দিকে যেমন তারা গ্রহ-নক্ষত্রের নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে, অন্য দিকে সাগরের গভীর তলদেশে পৌঁছে অজানাকে জানার পয়গাম নিয়ে এসেছে। এ সবই মানুষের এই সহজাত প্রেরণারই পরিণতি যে, সে আধুনিকপ্রিয় এবং উত্তম থেকে উত্তমতরের প্রতি আকর্ষিত।

সুতরাং প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম কেবল 'নতুন' হওয়ার কারণে কোন 'নতুন' বিষয়ের প্রতি কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। বরং সময়ে তাকে প্রশংসনীয় বলা হয়েছে এবং তাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

বিশেষত কারিগরি, শিল্প ও যুদ্ধের কলা কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে নতুন-নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করার বিষয়টি স্বয়ং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই প্রমাণিত আছে। গাযওয়ায়ে আহযাবের সময় সমগ্র আরব গোত্র সম্মিলিতভাবে মদীনায় আক্রমন করার পরিকল্পনা করলে, হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) তা প্রতিহত করার জন্য এমন একটি নতুন কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ দেন, যেটি আরবে এর আগে কখনো ব্যবহৃত হয়নি। সেই কৌশলটি ছিল, শহরের চারপাশে গভীর পরিখা খনন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরামর্শটি গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করেন। তিনি নিজেও পরিখা খননের কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

(আল বিদায়াহ ওয়ান্নিহায়াহ ৯৫.৪)

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) এর পরামর্শক্রমেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ যুদ্ধে দুটি নতুন যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে সেগুলো হযরত সালমান (রাযিঃ) নিজ হাতে তৈরি করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি ছিল আধুনিক কালের আগ্নেয়াস্ত্র জাতীয় অস্ত্র এবং অন্যটি ছিল ট্যাংক জাতীয়। (আল বিদায়াহ ওয়ান্নিহায়াহ ৩৪৮.৪)

এখানেই শেষ নয়। বরং হাফেজ ইবনে কাসীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ ও হযরত গায়লান ইবনে সালমা (রাযিঃ) কে সিরিয়ার জরস নামক শহরে পাঠিয়েছিলেন; যাতে সেখানে থেকে তারা আগ্নেয়াস্ত্র, কামান, ট্যাংক তৈরির প্রযুক্তি শিক্ষা করে আসে। জরস ছিল সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ শিল্প নগরী। এই দুই সাহাবী সিরিয়ায় সমরাস্ত্র-বিদ্যা অর্জনে নিরত ছিলেন বলেই তারা হুনাইন ও তায়িফ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। (তাবকাত ইবনে সাআদ-খ.২. পৃ. ২২১, তারিখে তাবারী পৃ. ১৬৬৯, আল বিদায়াহ ওয়ান্নিহায়াহ খ. ৪, পৃ. ৩৪৫)

হাফেজ ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদেরকে বেশি করে চাষাবাদ করার নির্দেশ দিতেন। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিতে উটের গোবর ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। (কানযুল উম্মাল খ. ২ পৃ. ২১৯)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড়ের ব্যবসা করার জন্য মানুষকে উপদেশ দান করতেন। কেননা, কাপড়ের ব্যবসায়ীরা মনে-মনে কামনা করে, মানুষ সুখী স্বচ্ছল থাকুক। (কানযুল উম্মাল খ. ২, পৃ. ১৯৭)

এমনকি নবী করীম সা. কতিপয় লোককে ব্যবসায়ের উদ্দেশে ওমান ও মিসরে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। (কানযুল উম্মাল খ. ২, পৃ. ১৯৭)

কৃষি ও খনিজ দ্রব্য থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

أطلبوا الرزق في خبايالارض

অর্থাৎ, জমিনে লুকায়িত নিয়ামতের মধ্যে তোমরা রিযিক অনুসন্ধান কর। (কানযুল উম্মাল খ. ২, পৃ. ১৯৭)

আরবের মানুষ নৌ জাহাজ কী তা জানত না। অথচ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দের সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আমার উম্মতের মধ্য হতে কিছু লোক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে পরাক্রমশালী সম্রাটের ন্যায় সামুদ্রিক ঊর্মি মালার উপর দিয়ে সফর করবে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ) অতঃপর মুসলমানদের প্রথম নৌবাহিনীর অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) হযরত উসমান (রাযিঃ) এর খিলাফতকালে প্রথম সামরিক নৌবহর পরিচালনা করেন এবং সাইপ্রাস, রোডস, ইরকালিয়ান, সিসিলি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে মুসলিম আধিপত্য সম্প্রসারিত হয়। এমনকি সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল তাদের দখলে চলে আসে।

تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی
بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی

একদিন এখানে সেই মরুচারীদের সমাগম ছিল। সাগরের উত্তাল তরঙ্গ যাদের জাহাজগুলোর খেলার মাঠ ছিল।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) অষ্টম হিজরীতে লখম এবং জুযাম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 'যাতুস সালাসিল' অভিযানে সর্ব প্রথম 'ব্লাক আউট' প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। সৈন্যদের মাঝে ঘোষণা করে দেন, তিন দিন পর্যন্ত শিবিরে কোন প্রকার বাতি বা আগুন জ্বালানো যাবে না। মুসলিম সৈন্যদল মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারেন, তখন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) উত্তরে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, শত্রু-সৈন্যের তুলনায় আমাদের সৈন্য ছিল কম। আমাদের সৈন্যস্বল্পতা টের পেয়ে শত্রুরা যাতে আমাদের উপর চেপে বসতে না পারে, সে জন্য রাতে আলো জ্বালাতে নিষেধ করেছিলাম। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমর-কৌশলটি পছন্দ করেছিলেন এবং এর উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিলেন।

(জামউল ফাওয়ায়েদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭)

সার কথা, এগুলো ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনার উদাহরণ। এ থেকে বুঝা যায় যে, নিছক নতুন

হওয়ার কারণে কোন নতুন পদক্ষেপ বা আবিষ্কারের উপর ইসলাম কোন আপত্তি তোলেনি। বরং বৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৈধ সীমার মধ্যে থেকে আধুনিকতা প্রীতিকে উৎসাহিত করেছে।

তবে এটাও বাস্তব সত্য যে, আধুনিকতা প্রীতি ও নতুনের প্রতি আকর্ষণ যেমনিভাবে মানুষকে বস্তুগত উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে, নতুন-নতুন আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত করেছে, দান করেছে ভোগ বিলাসের সর্বোত্তম পদ্ধতি; অনুরূপভাবে এটা মানুষকে আক্রান্ত করেছে অসংখ্য আত্মিক ব্যাধিতে। ধ্বংসাত্মক ক্ষতি সাধনও করেছে অনেক। এই প্রগতির আশির্বাদে মানবেতিহাস আজ অনেক ফেরাউন-সাদ্দাদে পরিপূর্ণ; ক্ষমতা ও সম্রাজ্যলিপ্সা যাদের কোন অবস্থাতেই নির্বাপিত হয়নি। অবশেষে তারা শক্তির অহমিকায় রাজত্বের সীমা ডিঙ্গিয়ে খোদায়িত্বের দাবী করে বসে। এই প্রগতি হিটলার ও মুসেলিনিকেও জন্ম দিয়েছে। যাদের রাজ্যলিপ্সু-মন প্রতিদিন একটি করে নতুন ভূখন্ডের নেতৃত্ব কামনা করত। সারা বিশ্বে আজ উলঙ্গপনা আর অশ্লীলতার ঝড় তুলেছে এই প্রগতিপ্রীতি। পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যভিচারকেও বৈধতার সনদ দিয়েছে। এমনকি আজ বৃটেনের সংসদে প্রবল করতালীর মাঝ দিয়ে সমকামিতার বিল মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই আধুনিকতাপ্রীতির পরিণতিতে আজ পশ্চিমা নারীরা গর্ভপাত ঘটানোর অনুমোদনের জন্য প্রকাশ্যে দাবী আদায়ে সোচ্চার হয়েছে। এই আধুনিকতাপ্রীতিকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে আজ মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনের দাবী করা হচ্ছে।

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, 'আধুনিকতাপ্রীতি' এক দু-ধারী তরবারীর ন্যায়। যা একদিকে যেমন মানুষের অশেষ উপকার সাধন করতে পারে। অন্যদিকে সর্বনাশা ক্ষতিও ডেকে আনতে পারে। অতএব একটি নতুন আবিষ্কার নিছক নতুন হওয়ার দরুন যেমন গ্রহণীয় হতে পারে না। আবার কেবল নতুন হওয়ার কারণে বর্জনীয়ও হতে পারে না। কিন্তু এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন মাপকাঠির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যে, কোন আবিষ্কারটি উপকারী ও সাদরে গ্রহণীয় এবং কোনটি ক্ষতিকারক ও পরিত্যাজ্য।

এই মানদন্ড নির্ধারণের একটি পদ্ধতি এও হতে পারে যে, বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিবেক-বুদ্ধির হাতে সমর্পন করা হবে। সেক্যুলার সমাজে বিবেক-বুদ্ধির কাছেই সিদ্ধান্তের ভার অর্পণ করা হয়। কিন্তু এখানে সমস্যা হল, 'প্রগতিবাদের' নামে যারা মনুষ্যসমাজ থেকে শিষ্টাচার এবং শালিনতার যাবতীয় গুণ ছিনিয়ে নিয়ে পশুত্ব এবং হিংস্রতার অন্ধকার গলিতে এনে দাঁড় করিয়েছে তারা সকলেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবীদার ছিল। তারা সকলেই আপন বিবেক-বুদ্ধিকে নিজের একমাত্র পথ প্রদর্শক বানিয়েছিল। এর প্রকৃত কারণ হল, ঐশ্বরিক জ্ঞানের নিয়ন্ত্রন হতে মুক্ত হওয়ার পর 'বিবেক-বুদ্ধির' উদাহরণ হল, এক বহুচারিণী প্রেমাস্পদের ন্যায়। পরস্পর বিরোধী চরম শত্রু একই সময়ে যাকে নিজের বলে ভাবে, অথচ সে কারো নয়। সুতরাং এমন 'বিবেক-বুদ্ধির', কাছে চরম নিকৃষ্ট, ঘৃণিত কাজ ও সিদ্ধান্তের স্বপক্ষেও অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য এবং মনোরম ব্যাখ্যা খুব সহজেই মিলে যাবে। উদাহরণত, হিরোশিমা ও নাগাসাকির নাম শোনা মাত্র আজও মানব সভ্যতা নেয়ে ঘেমে একাকার হয়ে যায়।

অথচ ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকার মত বিশ্বখ্যাত গ্রন্থে যে-এটমবোমা নিক্ষেপের কারণে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছিল, তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটমবোমার সংজ্ঞায় সর্ব প্রথম এই বাক্য.লিখা হয়েছে ঃ

Former prime minister Winston Churchill estimated that by shortening the war the atomic bomb had saved the lives of 10,00,000 U.S. soldiers 2,50,000 British soldiers.

(ব্রিটানিকা, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৪৭, মুদ্রণ ১৯৫০ ইং, প্রবন্ধ : এটমবোম)।

অর্থাৎ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল মনে করেন যে, এটমবোমা যুদ্ধ সংক্ষেপ করে দশলক্ষ মার্কিন সৈন্য এবং আড়াইলক্ষ বৃটিশ সৈন্যের জীবন রক্ষা করেছে। এবার ভাবুন, এ ধরণের যুক্তির অবতারনা করা হলে কোন্ জুলুম-বর্বরতাকে বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী বলা যেতে পারে?

বিবেক প্রসূত ব্যাখ্যার এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। এখানে লজ্জা শরমের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করে একটি উদাহরণ পেশ করব,

যাতে বিবেক-বুদ্ধির সঠিক অবস্থান দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলামী ইতিহাসে বাতেনিয়া নামক একটি পথভ্রষ্ট ফেরকার উদ্ভব ঘটেছিল। উবায়দুল্লাহ আল কিরওয়ানী নামক তাদের এক লিডার লিখেছেন ঃ

وما العجب من شئ كالعجب من رجال يدعي العقل ثم يكو ن له أخت أو بنت حسناء وليست له زوجة في حسنها فيحرمها علي نفسه و ينكحها من اجنبي ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأ جنبي ووجه ذالك إلا أن صاحبهم حرم عليهما الطيبات

(الفرق بين الفرق لعبد القا هر البغدادي)

অর্থাৎ, এরচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় আর কী হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এমন বোকামি করতে পারে যে, স্বীয় স্ত্রী অপেক্ষা সুন্দরী কন্যা বা বোন তার ঘরে রয়েছে; অথচ এই সুন্দরী কন্যা বা বোনকে নিজের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে তাকে অপরিচিত কোন ব্যক্তির কাছে বিয়ে দেয়। এই নির্বোধদের সামান্য বিবেক-বুদ্ধি থাকলে তারা বুঝত যে, কোন অপরিচিত ব্যক্তির তুলনায় স্বীয় রূপসী কন্যা বা বোনকে বিয়ে করার অধিকার তারই সবচেয়ে বেশি ছিল। এই নির্বুদ্ধিতার মূল কারণ, তাদের নবী তাদের জন্য উত্তম বস্তু হারাম করেছেন।

এই ঘৃণ্য মন্তব্যের প্রতি যত খুশি অভিশম্পাত করুন। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন তো, যে বিবেক আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তার কাছে এই যুক্তি খন্ডনের বিবেক প্রসূত কোন উত্তর আছে? বাস্তবতা হচ্ছে, কোন স্বাধীন বিবেকের কাছে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। তাই শত-শত বছর পর আজ উবায়দুল্লাহ কিরওয়ানীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে। পশ্চিমাদেশে আজ বোনকে বিবাহের দাবী উঠছে।

সার কথা হল, 'প্রগতিবাদের' রীতি অনুসারে যদি ভাল-মন্দের ফয়সালার ভার শুধু বুদ্ধির উপর ন্যাস্ত করা হয়, তাহলে একদিকে যেমন জীবনের কোন অংশই নিরাপদ থাকবে না। অন্যদিকে প্রত্যেকের বিবেক-বুদ্ধি অন্যের থেকে ভিন্ন রূপ হওয়ার কারণে মানুষ পরস্পর বিরোধী এমন সব ভুলের গ্যাড়াকলে ফেসে যাবে, যার থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় থাকবে না। কারণ যে বিবেক আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী জ্ঞানের বন্ধনমুক্ত, মানুষ তাকে বলে

মুক্ত-বুদ্ধি। মূলতঃ তখন সে তার পাশবিক কামনা এবং জৈবিক তাড়নার গোলাম হয়ে পড়ে। যেটা বিবেকের গোলামীর সর্ব নিকৃষ্ট পর্যায়। এ কারণে কুরআনে কারীমের পরিভাষায় এমন অকলকে هوى "হাওয়া" বা প্রবৃত্তি বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهم لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

সত্য যদি সে সব লোকদের প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে যেত, তাহলে আকাশ জমিন এবং সৃষ্টিকুলের মাঝে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি হত।

আইন দর্শনের আলোচনায় দার্শনিকদের এক দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাদের মতে চরিত্রকে বলা হয়, "Cognitvist Theory."। বিখ্যাত আইনবিদ ড. ফ্রয়েডমিন তার Leagal Theory গ্রন্থে এই মূলনীতির সার সংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

"Reason is and ought only to be the slave of the passions and can never pretend to any other office than to serve and obey them. (P. 36)

বুদ্ধি তো মানবীয় আবেগ ও প্রবৃত্তির গোলাম মাত্র। আর প্রবৃত্তির গোলাম হওয়াটাই তার জন্য যুক্তিযুক্ত। কেননা আবেগ ছাড়া বুদ্ধি কোন কাজই করতে পারে না। সে কেবল আবেগের অনুসরন করে।

এই মূলনীতির পরিণতি ড. ফ্রয়েডমিনের ভাষায় ঃ

"Every thing else but also words like 'good' 'bad' 'ought' 'worthy' are purely emotive and there cannot be such a thing as ethical and moral science" (P. 36-37)

প্রত্যেক বিষয় এমনকি ভাল-মন্দ, আবশ্যক-অনাবশ্যক ও উপযুক্ত-অনুপযুক্ত হওয়ার ধারণা আবেগ প্রসূত কথা এবং পৃথিবীতে নৈতিকতা বলতে কোন জিনিষের অস্তিত্ব নেই।

এই দৃষ্টিভঙ্গি আইন দর্শনের ভিত্তি হওয়ার জন্য যতই ভুল বা মন্দ সাব্যস্ত হোক, কিন্তু এটি এক ধর্মনিরপেক্ষ বিবেকের বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ। বাস্তব সত্য হল, ধর্মনিরপেক্ষ বিবেকের আনুগত্যের অনিবার্য পরিণতি এছাড়া

আর কিছুই হতে পারে না যে, নৈতিকতা বলতে কোন জিনিষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে না এবং মানুষের কথা ও কাজের উপর তার প্রবৃত্তিজাত আবেগ ছাড়া অন্য কারো রাজত্ব চলবে না। ধর্মনিরপেক্ষ বিবেক আর 'নৈতিকতা' কোন অবস্থায়ই সহাবস্থান করতে পারে না। কারণ, 'প্রগতিবাদের' ধারায় এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়, যখন মানুষের অন্তর একটি কাজকে খারাপ মনে করে; কিন্তু, 'প্রগতিবাদ' ও ধর্মনিরপেক্ষ বিবেকের নিকট সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার মত কোন দলিল থাকে না বলে তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আজ পশ্চিমা চিন্তাবিদগণ এই ভয়াবহ অসহায়ত্বের শিকার। বিগত কয়েক বছর পূর্বে বৃটেনের পার্লামেন্ট সমকামিতার যে আইনটি পাশ করেছে, বৃটেনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বুদ্ধিজীবী তাকে পছন্দ করেন নি। তথাপি তারা সেটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, প্রগতিবাদীদের দর্শনে যে মন্দ কাজগুলো প্রচলন ব্যাপকতা লাভ করে, সেগুলোকে আইনগত বৈধতা দেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। বিষয়টি বিবেচনার জন্য গঠিত বুলফিন্ডেন কমিটি যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে, তা নিম্নরূপ ঃ

"Unless a deliberate attempt is made by society acting through the agency of the law to equate this fear of crime with that of sin, there must remain a realm of private morality and immorality which in brief and crude terms, not the laws business. (The Legal Theory)"

আইনের অধীনে পরিচালিত সমাজের পক্ষ হতে যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝে শুনে এই প্রচেষ্টা চালানো না হবে যে, মানুষের মাঝে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ভয় অপরাধের গুনাহের সমপর্যায়ের বলে প্রতিভাত হবে; ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও অনৈতিকতার চিন্তা চেতনার আধিপত্য বহাল থাকবে - যাকে সুস্পষ্ট ভাষায় সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হবে যে তা আইনের পরিমন্ডলের আওতায় পড়বে না।

অথচ বাস্তব সত্য হল এই যে যদি "ভাল-মন্দ" নিরূপণের সমস্ত সিদ্ধান্ত নিরেট বিবেকের উপর ন্যস্ত করা হয়, তাহলে মানুষের কাছে এরূপ কোন

মানদন্ডই অবশিষ্ট থাকবে না, যার উপর ভিত্তি করে যে কোন নতুন প্রথাকে ঠেকানো যাবে। বরং অতিমূল্যবান চারিত্রিক শৃঙ্খলাও প্রগতিবাদের স্রোতে ভেসে যাবে।

আইনবিদগণ আজ খুবই চিন্তিত যে, প্রগতিবাদের এই অপ্রতিরোধ্য সয়লাবের মাঝে এমন কী নীতি অবলম্বন করা যায়, যাতে কমপক্ষে কিছু উচ্চ মানবীয় গুণাবলী সংরক্ষিত ও অপরিবর্তনীয় থাকবে। সুতরাং এক মার্কিন জজ বিচারপতি কার্ডোজো লিখেছেন ঃ

"আইনের জন্য আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হল, আইনের এমন একটি মুলনীতি তৈরি করা যেটা হবে স্থির ও অপরিবর্তনীয় এবং বিবাদমান পরিস্থিতির চাহিদাগুলোর মাঝে সমন্বয় বিধানকারী।" (The Growth of the Law)

কিন্তু এটা কোন মানবীয় বিবেক প্রসূত দর্শনের পক্ষে সম্ভব নয়। যাবতীয় বিপর্যয়ের সৃষ্টি এখান থেকেই যে ঐশি প্রত্যাদেশের দায়দায়িত্ব মনুষ্য বিবেক বুদ্ধির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তার উপর এমন এক অসহনীয় বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যা বহনের সামর্থ তার নেই। বস্তুত, কোন আইনকে স্থায়ী এবং অপরিবর্তনশীল হওয়ার দাবী করলে, তার পিছনে শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণ প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের জ্ঞান এমন কোন যুক্তি পেশ করতে অক্ষম। আজ কিছু লোক স্বীয় জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কোন একটি আইনকে অপরিবর্তনশীল বলে স্থির করবে; কাল অন্য জনের মনে হবে – এটা স্থায়ী আইন হওয়ার যোগ্য নয়। সুতরাং তারা সেটাকে পরিবর্তনশীল বলে ঘোষণা করবে। অতএব বিষয়টি সমাধানের একটি মাত্র পথ যা রয়েছে তাহল, মানুষ তার বুদ্ধিকে প্রবৃত্তির গোলাম না-বানিয়ে সেই মহান সত্তার গোলাম বানাবে, যিনি তাকে ও সমগ্র মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু পৃথবীর আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে তিনিই সম্পূর্ণরূপে অবগত। অতএব তিনি ব্যতীত অন্য কেউ বলতে পারে না যে, আইনের কোন ধারাটি অপরিবর্তনশীল। প্রখ্যাত আইন প্রণেতা জর্জ প্যাটন সত্যকথাই বলেছেন ঃ

"What interests should the ideal legal system protect? This is a question of values, in which legal philosophy plays its

part... But however much we desire the help of philosophy, it is difficult to obtain. No agreed scale of values has ever been reached indeed it is only in religion that we can find a basis, and the truths of religion must be accepted by faith or intuition and not purely as the result of logical argument." (Paton : Juris prudence P. 121)

আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি আদর্শ সমাজে কোন্ কোন্ বিষয়গুলো সংরক্ষণ করা উচিৎ ? এটি মূল্যবোধ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আইন দর্শন এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা দর্শনের কাছে যতই সাহায্য প্রার্থনা করি, ততই এই প্রশ্নের উত্তর মেলা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ, মূল্যবোধের এখন পর্যন্ত কোন সর্বসম্মত মাপকাঠি জানা যায়নি। বস্তুত একমাত্র ধর্মই হল এমন একটি বস্তু যাতে আমরা এর একটি শক্ত ভিত্তি পাই। তবে ধর্মীয় তত্ত্বকে কেবল যৌক্তিক প্রমাণ দিয়ে বিচার করলে চলবে না বরং গভীর অনুরাগ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

সারকথা যুগের নতুনত্ব সম্পর্কে ভাল-মন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সেকুলার চিন্তাজাত বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের জন্য এখন একটি মাত্র পথ অবশিষ্ট রয়েছে। তা হল, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিধি বিধান থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করা। মানবতার মুক্তির জন্য এটা ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। কুরআন কারীম ঘোষণা করেছে ঃ

أَفَمَنْ كَانَ عَلَي بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم (محمد ١٤)

যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ হতে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার মত, যার কাছে তার মন্দকর্ম সমূহ ভাল বলে মনে হয় এবং সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে? (মুহাম্মদ : ১৪)

সুতরাং এহেন সমস্যার একমাত্র সমাধান এই যে, যুগের প্রতিটি নতুন পন্থা পদ্ধতি ও আবিষ্কার, প্রতিটি নতুন প্রথা ও প্রচলনকে তার বাহ্যিক

চমকের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা চলবে না। বরং সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে এই ভিত্তিতে যে তা সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী হচ্ছে কি না। যদি সেই ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ থেকে থাকে তাহলে তাকে দ্বিধাহীনভাবে মেনে নিতে হবে। এ মর্মে কুরআনে কারীম ঘোষণা করেছে :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَي اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا (احزاب)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ এবং নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে। (আহযাব : ৩৬)

অন্যত্র ঘোষণা হয়েছে ঃ

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰي يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْافِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না-তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে করে; তারপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিবে। (নিসা : ৬৫)

আল্লাহ তায়ালা যে সকল বিধি বিধান স্বীয় গ্রন্থে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে প্রদান করেছেন, সেগুলো এমন সব বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট যে সব বিষয়ে কেবল জ্ঞানের উপর নির্ভর করলে সেগুলো মানুষকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যেতে পারে। মহান আল্লাহ যেহেতু অতীত ও ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত, সুতরাং কেবল তারই বিধান সর্বযুগে প্রযোজ্য হতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন ঃ

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে

দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্ববিষয়ে অবগত। (নিসা : ১৭৬)

এর থেকে আধুনিকতার ব্যাপারে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মানব-জ্ঞানের মাধ্যমে এই সব বিষয়ে হিদায়েত বা সঠিক সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব। তাই ওহী ও আহকামে শরীয়তের তীব্র প্রয়োজন। আর এ কারণেই আল্লাহর বিধানের হুবহু অনুসরণ করাও একান্ত জরুরী। যুগের কোন প্রথাকে প্রথমে নিজের জ্ঞান দ্বারা নির্ভুল এবং উত্তম বলে স্থির করে নিয়ে অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহকে তার সাথে ফিট করার জন্য টানাটানি করা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চোরাপথ অবলম্বন করা মোটেও সমীচীন নয়। কেননা, একে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ বলা যায় না; এটাকে বরং অনুসরনের নামে সংশোধন ও পরিবর্তন বলা যায়। যা করার অধিকার কোন মানুষের নেই। কেননা, এতে আল্লাহর বিধান নাযিলের আসল উদ্দেশ্যই পাল্টে যায়। ইত্তিবা বা অনুসরন বলতে বুঝায় যে, আল্লাহর বিধান সর্বাঙ্গিন ত্রুটিমুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ -এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কোনরূপ সংশোধন-পরিবর্তন ব্যতীত মানুষতা অম্লান বদনে গ্রহণ করবে। পৃথিবীর সমগ্র মানুষ মিলে চেষ্টা করলেও তাকে আল্লাহর বিধান হতে বিচ্যুত করতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

আপনার প্রতিপালকের বাণী যথার্থ সত্য ও ভারসাম্যপূর্ণ। তাঁর বাণীর কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। আর যদি অপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দিবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথা-বার্তা বলে থাকে। আপনার প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যারা তার পথ থেকে বিপথগামী; এবং তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তার পথে অনুগমন করে। (আনআম : ১১৫-১১৭)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰيٓ إِلَيَّ

যারা আমার সাক্ষাতের (কিয়ামতের) উপর বিশ্বাস রাখে না তারা বলে, এই কোরআন ছাড়া অন্য কোন কোরআন নিয়ে এসো অথবা একে পরিবর্তন করে দাও। তাদেরকে আপনি বলে দিন, একে নিজের পক্ষ হতে পরিবর্তন করে দেওয়ার অধিকার আমার নেই। আমি তো সেই নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে। (ইউনুস ঃ ১৫)

এই ধরনের অনুসরণ করতে গেলে কখনো যুগের প্রতিকূলতা ও চরম বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়। এ কারণে হাজারো সমস্যা দেখা দিতে পারে। যারা এই প্রতিকূল অবস্থা দৃঢ় চিত্তে মুকাবেলা করেন, তাদেরই আল্লাহর পক্ষহতে দুনিয়া ও আখিরাতে হিদায়েতের নিয়ামত নসিব হয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

যারা আমার পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়নদের সাথে আছেন।

(আনকাবুত ঃ ৬৯)

সুতরাং যে ঐশী বিধানের মাঝে বাহ্যিক লাভ দৃষ্টিগোচর হয়, সেটাকে গ্রহণ করা এবং যেখানে একটু কষ্ট বা প্রতিকূলতা দেখা দেয় সেটা প্রত্যাখ্যান করা কিংবা জটিল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তা এড়িয়ে যাওয়া মোটেই বৈধ নয়। কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী এই কাজের মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের বিড়ম্বনা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰي حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ اِنْقَلَبَ عَلٰي وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ

মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে; যদি সে কোন পার্থিব কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তাহলে ইবাদতের উপর কায়েম

থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। এমন ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।(হজ্জ ঃ ১১)

মোট কথা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যেক নতুনত্বের ভাল-মন্দ যাচাই করার মাপকাঠি হল, আল্লাহ-প্রদত্ত শরীয়তের বিধান। যদি তা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হয়, তাহলে সেটা গ্রহণীয়। আর যদি শরীয়তের বিধানের পরিপন্থী হয়, তাহলে শরীয়তের বিধানে কোনরূপ বিয়োজন-সংযোজনের পথ অবলম্বন না করে সে বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এতে যুগ-প্রথার বিরোধিতাই হোক বা মানুষ তাকে এই কাজের জন্য যত নিন্দা-বিদ্রুপই করুক। একজন মুসলমানের নিকট এই নিচুমনা বিদ্রুপের উত্তর শুধু এটাই ঃ

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (বাকারা ঃ ১৫)

তবে এই বিধান যে সব বিষয়ে কুরআন ও হাদীস ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব বা হারাম ও মাকরূহ হিসেবে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং এই বিধান সর্ব যুগে সর্বাবস্থায় অপরিবর্তনীয় থাকবে। আর যে বিষয়গুলো 'মুবাহ' এর অন্তর্ভূক্ত, সে সব বিষয়ে মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মানুষ সময়ের দাবী ও প্রয়োজন অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, জীবনের এমন বিষয় সংখ্যায় খুবই কম, যে ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত ফরয, ওয়াজিব, মাসনূন, মুস্তাহাব বা হারাম ও মাকরূহের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে এবং অপরিবর্তনীয় বলে সাব্যস্ত করেছে। পক্ষান্তরে জীবনের অসংখ্য বিষয় 'মুবাহ' এর অন্তর্ভূক্ত রাখা হয়েছে এবং তা গ্রহণ বা বর্জনের বিষয়টি সব সময় পরিবর্তনশীল।

সুতরাং ইসলাম আধুনিকতা বা প্রগতিবাদের বিকাশের জন্য যে ক্ষেত্র দান করেছে, তা অত্যন্ত ব্যাপক। এর মাঝে সে তার পূর্ণ কর্মদক্ষতা দেখাতে পারে। মানুষ স্বীয় মেধা কাজে লাগিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির

চরম শিখরে পৌঁছে যেতে পারে। এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মানবতার জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

অতএব আজ মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, প্রগতিবাদের বৈধ-অবৈধের সীমা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। ইসলাম মানুষকে আধুনিকতার বিকাশের জন্য যে প্রশস্ত ক্ষেত্র দান করেছে, তা গ্রহণ না করে শরীয়তের বিধান যে সব সীমিত বিষয়ের সীমানা নির্দ্ধারণ করেছে এবং যে সব বিষয়কে অপরিবর্তনীয় বলে ঘোষণা করেছে, তার মধ্যে অনধিকার চর্চা না করা। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা হল-যে ময়দানে নব উদ্ভাবন-আবিষ্কারের পথ অবলম্বন করার ছিল, সেই ময়দানে আমাদের চেষ্টা-তদবির একেবারে শূণ্য। অন্যদিকে আল্লাহর যে বিধানাবলী অপরিবর্তনশীল, মুসলমান আজ তাদের প্রগতিবাদের লাগামহীন ঘোড়া সেই দিকে ধাবিত করেছে। এরই অনিবার্য পরিনতি হিসেবে চলমান যুগ মানবতার জন্য কল্যাণকর যা কিছু উপহার দিয়েছে, তা থেকে আমরা বঞ্চিত। আর যে অনিষ্টতা এ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তা দ্রুত বেগে আমাদের সমাজে সংক্রামিত হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যুগ-চাহিদা অনুসারে স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের তাওফীক দিন।

ইসলাম ও শিল্পবিপ্লব

যুগ প্রতিনিয়ত দ্রুত পরিবর্তনশীল। প্রতিটি নতুন যুগ নিয়ে আসে নতুন-নতুন সম্ভাবনা ও কিছু নতুন জিজ্ঞাসা। কিন্তু যন্ত্র আবিষ্কারের পর গোটা বিশ্বে যে বিপ্লব ঘটে গেছে, তাতে জীবনের এমন একটি ক্ষেত্র বাকি নেই, যেখানে তার ছোঁয়া লাগেনি। এই বিপ্লব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় গবেষণা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কিছু নতুন জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। ইসলাম ছাড়া অপরাপর ধর্মের মূল শিক্ষার উপর দৃষ্টি বুলালে দেখা যাবে, এই মহা বিপ্লবকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নেয়ার কোন যোগ্যতাই তার মাঝে নেই। আল্লাহর ওহীর পরিবর্তে মানুষের মেধাই ছিল সেই শিক্ষার মূল উৎস। এ কারণে, তার মধ্যে মানব-স্বভাবের প্রতি যেমন ছিল না কোন ভ্রূক্ষেপ, তেমনি ছিল না যুগের পরিবর্তনশীল অবস্থার যথাযথ মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাসমূহের উপর বিচক্ষণ দৃষ্টি। এর অনিবার্য ফল স্বরূপ, ঐ সব ধর্মের অধিকাংশ মৌলিক শিক্ষা আজ যন্ত্রের ভারের নীচে চাপা পড়ে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। সে সব ধর্মের অনুসারীদের সামনে এখন দুটি মাত্র পথ অবশিষ্ট রয়েছে। যদি তারা যুগের সাথে সমান কদমে চলতে চায়, তাহলে তাদের ধর্মকে বিসর্জন দিতে হবে। আর যদি ধর্ম তাদের কাছে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে জ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল আলোকরশ্মি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে এবং এ কথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, তারা বিংশ শতাব্দীর মানুষ নয়। তবে বিচক্ষণ শ্রেণীর কিছু লোক একটি মধ্যমপন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। তারা প্রাণপণ কোশেশ করে ধর্মকে অপারেশন করার চেষ্টা করেছেন। এবং কেটে-ছিড়ে তাকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, এই অপারেশনকৃত ধর্মকে তাদের আসল ধর্ম মনে করা, মনকে ব্যর্থ শান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তব সত্য হল, তাদের

আসল ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন তাদের কাছে কেবল ধর্মের নামের বাহ্যিক খোলসটুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বস্তুতঃ সেই খোলসে এক নতুন ধর্মের আত্মস্বত্ত্বা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে।

কিন্তু ইসলাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিশ্ব চরাচরে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যার শিক্ষা সদা সঞ্জীব। পৃথিবীতে যত বিপ্লবই ঘটুক, যুগ যতই পরিবর্তিত হোক, এটা কখনো পুরনো হবে না। আজও সে সজীব এবং যতদিন পৃথিবীতে পটপরিবর্তন অব্যাহত থাকবে ততদিনই সে সজীব থাকবে। এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট। কেননা এর মূলনীতি ও বিধি-বিধান ভাবী-অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ মানব-মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। তার যাবতীয় শিক্ষার মূল উৎস আল্লাহর ওহী। যে সত্তা সেগুলোকে মানুষের জন্য জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন তিনিই মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা। মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে এবং মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কেও তিনি ভাল জানেন। পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত এবং ভবিষ্যতে কখন কি হবে তাও তাঁর নখদর্পণে।

ইসলামের যে বিধান তিনি আল-কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার শিক্ষা প্রদান করেছেন, সেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট যাবতীয় বিষয়ের উপর পরিব্যপ্ত। এটা তাঁর পবিত্র কালামের অলৌকিকত্ব। পৃথিবীতে হাজার পরিবর্তন ঘটলেও এই শিক্ষাকে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা কখনো আসতে পারে না। ইসলামী মূলনীতি ও বিধি-বিধান প্রত্যেক যুগের মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ মুসলিম বিশ্বের প্রগতিবাদী নামধারী একটি শ্রেণী এই সত্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ কারণে তারা অন্য ধর্মের দেখাদেখি ইসলামেও কাট-ছাট শুরু করে দিয়েছেন। শিল্পবিপ্লবের যাবতীয় ভুল-নির্ভুল বিষয়ই ইসলামের অনুকূল এ কথা প্রমাণ করাকে নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্ব বলে ধরে নিয়েছেন। এই পরিবর্তন-সংকোচনের পিছনে তাদের সবচেয়ে বড় দলিল হল, শিল্পবিপ্লবের পর দুনিয়া অনেক বদলে গেছে এবং পরিবেশেও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। অতএব ইসলামের বিধানকেও অবশ্যই পরিবর্তন করা উচিৎ।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে চাই যে, ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের ফলে জীবনের প্রতিটি শাখায় যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা মূলতঃ দুই ধরনের। কিছু পরিবর্তন বর্তমান উন্নতির জন্য অত্যন্ত দরকারী। এটা ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বর্তমান অবস্থানে পৌঁছা ছিল অসম্ভব। এর কারণে পৃথিবী নতুন-নতুন আবিষ্কারের সাথে পরিচিত হয়েছে। তৈরি হয়েছে বিশাল-বিশাল কারখানা, নির্মিত হয়েছে বড়-বড় সেতু, বেড়িবাঁধ। মানব জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের এই শাখাটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। মুসলিম বিশ্বের জন্যও এই ময়দানে সামনে অগ্রসর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইসলাম এক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি কেবল এতটুকুই নয়, বরং এই শক্তি সঞ্চয়কে অত্যন্ত সুনজরে দেখেছে।

পক্ষান্তরে কিছু পরিবর্তন এমন, যা বস্তুগত উন্নতির জন্য একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। পশ্চিমাগোষ্ঠী এগুলোকে অযথাই শিল্পবিপ্লবের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে। আজ তারা নিজেদের এহেন খামখেয়ালিপনার জন্য নিজেরাই রোদন করে মরছে। অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা, নর-নারীর অবাধ মেলামেশা, গান-বাদ্য, সূদ, জন্মনিয়ন্ত্রন প্রভৃতি বিষয়গুলির সাথে বস্তুগত বা শৈল্পিক উন্নতির সামান্যতম সম্পর্কও নেই। বরং অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত যে, এগুলো উন্নতি ও অগ্রগতির পথে কখনো কোন সাহায্য তো করেইনি; উল্টো উন্নতি-অগ্রগতির পথে বাঁধার সৃষ্টি করেছে।

নৈতিকতা বিনাশী এসব বস্তু মুসলিম বিশ্বকে সতর্কতার সাথে পরিহার করে চলতে হবে। মুসলিম বিশ্বেও শিল্পবিপ্লব অবশ্যই আসা দরকার। তবে পশ্চিমা সভ্যতার যে অভিশপ্ত বিষয়গুলি তাদেরকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে, তার থেকে পূত-পবিত্র শিল্পবিপ্লব হতে হবে। দুঃখের বিষয় হল, আমাদের প্রগতিবাদী শ্রেণী চান, ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের বিন্দু-বিসর্গ হেরফের না-করে হুবহু যেন আমরা তা গ্রহণ করি। কার্যত যখন থেকে আমাদের সমাজে যন্ত্রের কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে, সেই সাথে সাথে বরং তারও পূর্ব হতে আমরা সেসব চিন্তা ও কর্মের গোমরাহীর মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে গেছি। এ কারণে তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির চেয়ে ইসলামকে টেনে-হিঁচড়ে ইউরোপীয় সভ্যতার সদৃশ বানানোর পিছনেই নিজেদের শ্রম বেশী

ব্যয় করছেন। 'তাহকীকাতে ইসলামী' নামক প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র মাসিক 'ফিকর ও নজর' স্বীয় কার্যক্রমের স্বপক্ষে দলিল পেশ করতে যেয়ে লিখেছে ঃ

"চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সম্পন্ন হলে পাকিস্তানের সামগ্রিক জীবন ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। সূচনা হবে যান্ত্রিক যুগের। এর প্রভাবে পারিবারিক জীবনেও আসবে পরিবর্তন। বদলে যাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ধারা। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দেবে। সন্দেহ নেই যে, এতে ব্যক্তিগত ও জাতীয় চিন্তা-চেতনা প্রভাবিত হবে এবং মানুষ নতুন করে ভাবতে শুরু করবে। (ফিকর ও নজর পৃ. ৭৩৩, খ. ২, সংখ্যা. ১২)

এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়, তাঁরা মুসলিম বিশ্বের শিল্পবিপ্লব আর ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের মাঝে কোন পার্থক্য দেখতে চান না। আমাদের বক্তব্য হল, আমাদের সমাজে 'যান্ত্রিক যুগের সূচনা' দোষণীয় নয়। কিন্তু এর প্রভাবে পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ধারায়, নারী-পুরুষের সম্পর্কে এবং মানুষের চিন্তার জগতে যে পরিবর্তনের কথা আপনারা বলছেন, সেগুলোকে আমরা মুসলিম বিশ্বের জন্য বিষ তুল্য মনে করি। এই 'পরিবর্তন' ইসলামী জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। স্বয়ং পশ্চিমা সভ্যতাই আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, যান্ত্রিক কার্যক্রমে প্রবেশ করা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন-যাপন করতে হলে আমাদেরকে এই সব 'পরিবর্তন' থেকে দূরে থাকতে হবে।

মরহুম ইকবাল ইউরোপীয় কালচার গভীরভাবে অধ্যয়নের পর লিখেছেন ঃ

افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے ہے یہ پوش

"ইউরোপীয় যন্ত্রের ধোয়া থেকে বেরিয়ে আসে কৃষ্ণ বেশী ডাকাত।"

অন্যত্র লিখেছেন ঃ

ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت
احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

যান্ত্রিক অধিপত্য হৃদয়তন্ত্রীর জন্য এক মৃত্যু সংবাদ
শালীনতা-মানবতা সবই সে করেছে ধূলিসাৎ।

এর থেকে এমন ধারণা করা সঠিক নয় যে, যান্ত্রিক সভ্যতার সাথে তাঁর বৈরিতা ছিল এবং তিনি প্রযুক্তিগত উন্নতির বিরোধী ছিলেন। বরং তাঁর বক্তব্য ছিল, পশ্চিমা গোষ্ঠী যন্ত্রের সাথে যে সব আপদ্ অহেতুক মানব জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলো নিন্দনীয় এবং বর্জনীয়।

অতএব বর্তমান অবস্থায় আমাদের উচিৎ, শিল্পবিপ্লবের মোহে পড়ে চোখ বন্ধ করে সেই সব রাস্তা গ্রহণ না করা, যেগুলো ইউরোপীয়দেরকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। বরং পূর্ণ সতর্কতার সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে হবে; যাতে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। শিল্পবিপ্লব নতুন যে বিষয় উপস্থাপন করবে, ইসলামে তার এমন সমাধান বিদ্যমান রয়েছে, যা ইউরোপীয় ভ্রষ্টতা থেকে পূত-পবিত্র। ইসলাম 'আহকামে ইস্তিম্বাত' এর যে মূলনীতি নির্ধারণ করেছে উলামায়ে কিরামকে তার আলোকে এর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

পক্ষান্তরে ইসলামকে কেটে ছেটে যদি পশ্চিমা সভ্যতার আদলে ফিট করার জন্যে ইসলামকেই পরিবর্তন করে ফেলা হয় এবং যেন-তেন ভাবে সেটাকে সমকালীন চাহিদার অনুকূল করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আপনারাই বলুন, এর মাঝে ইসলামের কী কৃতিত্ব ? এভাবে ভেঙ্গে মেরামত করে ধর্মকে যুগ চাহিদা মুতাবেক ফিট করা যেতে পারে এবং অনেক ধর্মের বুদ্ধি জীবীরা (?) করেছেনও। আমাদের মতে এভাবে কোন ধর্মকে টেনে হেঁচড়ে যুগ-চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন করা সেই সব বুদ্ধিজীবীদের(?) কৃতিত্ব হতে পারে, কিন্তু এটা ইসলামের জন্য কোন কৃতিত্ব আদৌ নয়। আমরা মনে করি, ইসলামকে অন্য ধর্মের সাথে তুলনা করে তার সাথে এরূপ ব্যবহার করা মোটেও ঠিক নয়। এ ধরনের সকল প্রচেষ্টাই দ্বীনকে বিকৃত করার প্রচেষ্টা এবং তা নিন্দনীয়।

তবে ইসলামের অনেক আহকাম ও মাসআলার ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। যুগ ও অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এগুলো পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট মূলনীতি রয়েছে। তবে ইসলামের সকল

বিধানই এই মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত নয়। মূলতঃ কুরআন, সুন্নাহ, 'ইজমায়ে উম্মত' (উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) দ্বারা যে সকল বিধি-বিধান সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত সেগুলা অপরিবর্তনীয়। এবং কোন যুগেই তাকে পরিবর্তন করা যায় না। আর যে সব ক্ষেত্রে যুগের পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে পারে, সেক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ কোন বিধান নির্ধারন করার পরিবর্তে কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যার আলোকে প্রত্যেক যুগেই বিধান উদ্ভাবন করা যায়। অন্যথায় কুরআন-সুন্নাহর লক্ষ্য যদি এটাই হতো যে, প্রত্যেক যুগের মুসলমান স্বীয় যুগের অবস্থানুসারে এবং পূর্ববর্তী উম্মতের 'ইজমায়ী' (সর্বসম্মত) সিদ্ধান্তের বিপরীত নিজেরাই বিধান তৈরি করে তাকে 'ইসলামী বিধান' হিসেবে স্থির করতে পারবে, তাহলে কুরআন-সুন্নাহকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এত বিস্তারিত বিধান প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল কি? শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, প্রত্যেক যুগের যুগ-চাহিদা অনুযায়ী তোমরা বিধান বানিয়ে নাও। মূলতঃ কুরআন-সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমা দ্বারা যে বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হল, কিয়ামত পর্যন্ত সেই বিধানই প্রযোজ্য হবে। কোন যুগেই তার সামান্যতম পরিবর্তনও করা যাবে না। সুতরাং যুগ পরিবর্তনের অজুহাত দিয়ে এই সব বিধানকে পরিবর্তন করা যায় না। কিয়ামত পর্যন্ত এগুলো শুধু অবশ্য পালনীয় আমল যোগ্যই নয় বরং; এর ভিতর মুসলমানদের বস্তুগত উন্নতিরও মূল রহস্য নিহিত রয়েছে।

তবে কুরআন ও সুন্নাহ যে বিষয়গুলো যুগের হাতে সর্ম্পণ করেছে সেগুলো অবশ্যই পরিবর্তন যোগ্য। প্রত্যেক যুগের অবস্থার প্রেক্ষাপটে তার মধ্যে পরিবর্তন করা যাবে এবং করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রগতিবাদী শ্রেণী যুগের পরিবর্তনের ধোয়া তুলে চৌদ্দশত বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা ইজমায়ী বিধানকে পরিবর্তন করেই ক্ষান্ত হতে চান না, বরং তারা অনেক আকাঈদকেও পরিবর্তন করতে চাইছেন। যেটা কুরআন-সুন্নাহ -এর সুস্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী এবং আজ পর্যন্ত কোন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিও যাকে সমর্থন করেন নি।

তাদের এই পরিবর্তন যদি যথার্থ হয়, তাহলে তো এই বিষয়টিও অত্যন্ত গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন হবে যে, যে ধর্মের মৌলিক আকিদাগুলো

পর্যন্ত দীর্ঘ চৌদ্দশ বৎসর যাবৎ কোন একজন ব্যক্তিও নির্ভুলভাবে বুঝতে পারল না, সে ধর্ম কি কোন বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের জন্য সত্য মনে করে তার অনুসরণ করার যোগ্য ?

তবে মজার ব্যাপার হল, পরিবর্তন দ্বারা যখন কোন বৈধতা আবিষ্কার করা কিংবা ইউরোপীয় কোন দর্শনকে ইসলামের অনুকূল প্রমাণ করা উদ্দেশ্য হয়, তখনি আমাদের প্রগতিবাদীগণের চোখে 'যুগ-পরিবর্তন' দৃষ্টি গোচর হয়। আর যেখানে যুগ পরিবর্তনের ফলাফল কোন কষ্টকর কাজের আকারে প্রকাশ পায়, সেখানে যুগ-পরিবর্তনের কথা কারো মনেই আসে না। এর একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ এই যে, প্রগতিবাদীদের পক্ষ হতে অনেকবারই এই আওয়াজ ওঠেছে যে, যুগ বদলে গেছে। এই যুগে সূদ হালাল হওয়া উচিৎ। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রগতিবাদীর কণ্ঠেই এ কথা শোনা যায়নি যে, যুগ বদলে গেছে। অতএব নামাযে 'কছর' (সংক্ষিপ্ত করণ) এর বিধান রহিত হওয়া উচিৎ। এই অনুমতি সফরে যখন অস্বাভাবিক কষ্ট হত সেই সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। সুতরাং যারা বিমানে বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ীতে করে সফর করে, তাদের জন্য রোযা ভাঙ্গা এবং নামায সংক্ষিপ্ত করার অনুমতি নেই।

কর্ম পদ্ধতির এরূপ পার্থক্য থেকে আপনি নতুনত্বের বৈধতা-প্রিয়-মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন যে, মূলতঃ তাদের যাবতীয় দলিল পূর্ব হতে প্রতিষ্ঠিত-দর্শনের জন্য তৈরা করা হয়। দৃষ্টিভঙ্গি থাকে পশ্চিমা দর্শনকে ইসলামের মধ্যে ঢুকানো। সুতরাং যেখানে তাদের এই উদ্দেশ্য সফল হয়, সেখানে একেবারে সাধারণ কথাটিও দলিল হিসেবে গৃহীত হয়। আর যেখানে সেই দলিলটিই তাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়, সেটা আর তখন গ্রহণযোগ্য হয় না। আমাদের প্রগতিবাদী শ্রেণীর ভাইয়েরা যদি এই সত্য কথাগুলো একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতেন, তাদের গবেষণা কর্মগুলো ইসলামকে বিকৃত করার পরিবর্তে যদি কোন গঠনমূলক খেদমতে ব্যয় হত, তাহলে জাতির জন্য কতই না মঙ্গলজনক হত !

যুগ-চাহিদা

আলেম সমাজকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, এমন শ্লোগান আজ কাল হর-হামেশাই শোনা যাচ্ছে। জাতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মুখ থেকে প্রায়ই উচ্চারিত হচ্ছে এই বাক্য। উঁচু স্তরের কোন সাধারণ মজলিসে ধর্মীয় আলোচনা আসলেই এখন এই বাক্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সমাজের যেই শ্রেণীর মানুষ আজ প্রগতিবাদের আড়ালে ইসলামের সর্বসম্মত মূলনীতি ও বিধানকে কাটছাট করার কাজে নিরত আছেন, উলামায়ে হককে তারা তাদের পথের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক মনে করছেন। উলামায়ে হকের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া এবং তাদের সমালোচনা করাকেই তারা স্বীয় জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য বলে মনে করেন। এ কারণে, নবীন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করার জন্য 'যুগচাহিদা'র অস্পষ্ট বাক্যটিকে তারা উৎকৃষ্ট শ্লোগান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এর সাহায্যে তাঁরা আজ জাতির কাছে প্রতিনিয়ত আপিল জানচ্ছেন, আলেমগণ উন্নতি-অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় এবং সমাজের বোঝা স্বরূপ। অতএব তাদের কোন কথাই গ্রহণযোগ্য নয়।

এই সকল লোকের বিষয় আমরা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করছি, যিনি সকলের মনের যাবতীয় গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত। তবে সমাজে এমন কিছু লোক আছেন, যারা আলেমদের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ধারণা পোষণ করেন যে, তাঁরা আধুনিক যুগ-চাহিদা সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন, তাই তাঁরা প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয়ের বিরোধিতা করেন। এমন লোকদের সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। তবে আলোচনার পূর্বে আমাদের নিবেদন হল, বাস্তবিকই যদি তাঁরা নিষ্ঠার সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের মঙ্গলকামী হয়ে থাকেন, তাহলে অত্যন্ত স্থির ও শান্ত মেজাজে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবেন। এবং কিছু সময়ের জন্য আবেগপূর্ণ শ্লোগানের মোহ থেকে মস্তিষ্ককে মুক্ত করে একটু ভাবতে চেষ্টা করবেন যে, 'যুগ-চাহিদার' প্রকৃত

অর্থ কী ? তা পূর্ণ করার প্রকৃত পন্থা ও পদ্ধতিই বা কী ? এ ব্যাপারে আলেমদের উপর যে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, ঘটনাবহুল পৃথিবীতে তার বাস্তবতা কতটুকু ?

সর্বপ্রথম নির্ধারণ করার বিষয় হল, 'যুগ-চাহিদা পুরনের' অর্থ কী ? আমার মনে হয় রাত-দিন যারা যুগ-চাহিদার গুরুত্বের সবক দানে নিরত তাদের মাথায়ও এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। সারাক্ষণ তারা এই অস্পষ্ট শ্লোগান দিয়ে আসছেন যে, উলামায়ে কিরাম যুগ-চাহিদার পরিপন্থী। কিন্তু তারা কখনো পরিষ্কার করে বলেননি, সেই চাহিদাটা কী; যার বিরোধিতায় আলেমগণ উঠে-পড়ে লেগেছেন। যুগ-চাহিদার অর্থ যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যাবতীয় উপকণ দ্বারা সমৃদ্ধি অর্জন হয়, যা ব্যতীত বর্তমান বিশ্বে স্বাধীনভাবে শ্বাস নেয়া সম্ভব নয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা সময়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দাবী। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে কেউ আমাদেরকে এ কথা বলবেন কি যে, কোন্ আলেমে দ্বীন যুগের এমন গুরুত্বপূর্ণ দাবীকে নাজায়েয বলেছেন ? কখন কোন্ আলেম ফাতওয়া দিয়েছেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ময়দানে অগ্রগতির চেষ্টা করা হারাম, নাজায়েয বা অর্থহীন ? নিকট অতীতে বিজ্ঞান কী রূপ বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছে! দেখতে-দেখতে নতুন আবিষ্কারের ঢের লেগে গেছে। এসব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহের মধ্যে কোন্ কোন্টির আলেমগণ বিরোধিতা করেছেন ? বিদ্যুৎ, তার, টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, ওয়্যারলেস, রেডিও, টেপরেকর্ডার, গাড়ি, মটর, হাওয়াই জাহাজ, স্টীমার, রেল গাড়ি; যুদ্ধাস্ত্রের মাঝে ট্যাংক, কামান, বিভিন্ন প্রকার বোমা, ফাইটার, সাবমেরিন, রকেট, মিসাইল, রাডার; শিল্প ক্ষেত্রে নানা রকমের মেশিন, কারখানা; কৃষি ক্ষেত্রে ট্রাকটর, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ; চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপারেশনের যন্ত্রপাতি, রোগ নির্ণয়ের জন্য যন্ত্রপাতি; শিক্ষা ক্ষেত্রে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান ইত্যাদির মাঝে কোন্টির ব্যাপারে আলেমগণ বিরোধিতা করেছেন বা তার উন্নতি ও অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন ?

আমাদের উন্নয়নশীল দেশের বিশ বছরের ইতিহাস আমাদের সামনে। এই সময়ে উলামায়ে হক ও দ্বীনদার শ্রেণীর ঐকান্তিক প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশ শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে বহু দূর এগিয়ে গেছে। বড় বড় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এই সময়ের মাঝে বাস্তবায়িত হয়েছে। বড় বড় কারখানা তৈরি হয়েছে। বিশাল দৈর্ঘ-প্রস্থ বিশিষ্ট সড়ক নির্মিত হয়েছে। পানি প্রবাহিত করার জন্য বহু খাল খনন করা হয়েছে। নদীর উপর বাধ নির্মাণ করা হয়েছে। যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর পুরাতন ব্যবস্থাপনা আস্তে-আস্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ের কলেজ-ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অসংখ্য অনাবাদী এলাকা আবাদ হয়েছে। এমন নির্বোধ লোক কে ? যে এই উন্নতিতে অসন্তুষ্ট ? একজন আলেমে দ্বীনের নাম বলুনতো, যিনি বলেছেন, বস্তুগত উন্নতির এসব পন্থা অবলম্বন করো না, দেশে কুশলী বৈজ্ঞানিক তৈরি করো না, মানুষকে ইঞ্জিনিয়ারিং এর উচ্চ শিক্ষা দিও না, কারখানা নির্মাণ করো না, সড়ক, ব্রীজ, খাল ও বাঁধ নির্মান করো না, দেশের আত্মরক্ষার জন্য উন্নত সমরাস্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করো না, সৈন্যদের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ দান করো না, জীবন যাত্রার উন্নত মাধ্যমগুলো অবলম্বন করো না বা নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিও না ?

কোন আলেমে দ্বীন যদি এটা না বলে থাকেন – মূলতঃ কেউ এমন কথা বলতে পারেনা– তাহলে উলামায়ে হকের উপর ভিত্তিহীন এই অপবাদকে বিদ্বেষ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে ? উলামায়ে হকের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ! অসংখ্য আলেমের কথা আমাদের জানা আছে, যাদের আশা-ভরসার কেন্দ্র-বিন্দু বিদেশ নয় স্বদেশ। তাদের মনের সবচেয়ে বড় কামনা হল, ইসলামের সিরাতে মুস্তাকিমের উপর অটল থেকে জাগতিক দিক থেকেও দিন-দিন উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হোক। এ কারণে, এই সকল আলেমগণ একদিকে যেমন মুসলমানদেরকে তাগিদ দিয়েছেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নত প্রশিক্ষণ আমাদের দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়; এই দায়িত্ব পালনে যদি আমরা অবহেলা করি, তাহলে আল্লাহর দরবারে আমরা অপরাধী হব; অন্য দিকে তাদের রাত-দিনের দু'আ এই কাজের জন্যই বরাদ্দ যা একমাত্র সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহই জানেন।

সংক্ষিপ্তভাবে আমরা এখানে বর্তমান যুগের এমন কিছু উলামায়ে কিরামের উদ্ধৃতি পেশ করব, যাদের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরোধিতার অপবাদ দেওয়া হচ্ছে।

পাকিস্তানে আলেমগণের মাঝে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ)ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার এক কনফারেন্সে পাকিস্তানের আলেমগণের পলিসি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন ঃ

"নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে যেরূপ আচরণই করুন, আমরা খালেছ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য আমাদের নবগঠিত রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও নিরাপদ করার প্রচেষ্টায় সামান্যতম অবহেলা করব না।" (সভাপতির ভাষণ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম কনফারেন্স, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯, পৃ: ৬, মুদ্রণ করাচী)।

ঐ ভাষণেই অন্যত্র তিনি বলেন, "আমাদের স্বীয় সামর্থের শেষ বিন্দু পর্যন্ত জাগতিক বস্তুগত মাধ্যমগুলো সংগ্রহে অবহেলা করা উচিৎ নয়, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের শত্রুর মনোবলকে ভেঙ্গে দিতে পারি এবং তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করতে পারি। কেননা, এটা কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. الخ এর অন্তর্ভূক্ত।" (ঐ পৃ: ২৩, ২৪)

আরো বলেন, "আমার মতে আমাদের সকল কল্যাণ ও কামিয়াবীর রহস্য এই চার শব্দের মধ্যে নিহিত ঃ

১. ধৈর্য ও সহনশীলতা,

২. তাকওয়া,

৩. ঐক্য

৪. সামর্থ অনুযায়ী শক্তি সঞ্চয়।

যার সার কথা হল, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আল্লাহর সাথে নিজ সম্পর্ক নির্ভেজাল রাখতে হবে, যাতে তাঁর সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া যায়। আর সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বীয় সামর্থের শেষ বিন্দু পর্যন্ত এমন শক্তি সঞ্চয় করতে হবে যাতে করে ইবলিসের বাহিনীর সকল শক্তি-সাহস ভেঙ্গে যায়।

মুফতি মুহাম্মদ শফী ছাহেব (রহঃ) তাঁর জিহাদ নামক পুস্তিকায় লিখেছেন ঃ

"ধৈর্য ও তাকওয়া এবং আল্লাহর উপর ঈমান ও তাওয়াক্কুলতো মুসলমানদের মৌলিক ও অপরাজেয় শক্তি। সেই সাথে এটাও জরুরী যে, প্রত্যেক যুগ ও স্থান উপযোগী সমরাস্ত্রও সংগ্রহ করতে হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় যুদ্ধের ট্রেনিং এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তৎকালীন যুগে যুদ্ধের যে সব অস্ত্র পাওয়া যেত সেগুলো সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে কাছীর (রহঃ) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে গাযওয়ায়ে হুনাইনের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই সাহাবী হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ ও গায়লান ইবনে আসলাম সেই যুদ্ধে শুধু এ কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি যে, তাঁরা বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধাস্ত্র ও আসবাব উপকরণের প্রযুক্তিগত দিকের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য দামেস্কের এক শিল্প সমৃদ্ধ শহরে গিয়ে ছিলেন। কারণ, সেখানে কামান বহনের জন্য এমন সামরিক যান তৈরি হত, যার দ্বারা ট্যাংকের কাজ চালানো যেত। অনুরূপভাবে কামানের কারিগরি বিদ্যাও সেখানে বিদ্যমান ছিল।

এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের জন্য নিজ দেশের নিরাপত্তার খাতিরে সামরিক অস্ত্র-সস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া জরুরী এবং অন্যের মুখাপেক্ষী থাকা অনুচিৎ। নয়তো এই সামরিক যান এবং কামান সেখান থেকে খরিদ করেও আমদানী করা যেত। আমাদের দায়িত্ব হল, ভেবে দেখা যে, এর প্রয়োজনীয়তা আমাদের জন্য কত বেশী। বর্তমান যুগে যুদ্ধের জন্য যে ধরণের এবং যে পরিমাণ সমরাস্ত্রের প্রয়োজন, তার থেকে কোন অংশে আমরা যেন পিছিয়ে না থাকি। এবং ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সেই সব অস্ত্র-সস্ত্রে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চালাই।"

(জিহাদ, ৫৩-৫৬ মুদ্রণ, করাচী ১৯৬৫)

'আলাতে জাদিদাহ' নামক অন্য একটি গ্রন্থে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, "সার কথা হল প্রযুক্তি ও আবিষ্কার নতুন বা পুরান যাই হোক, যার সাথে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির সম্পর্ক বিদ্যমান সবই মানুষের জন্য

আল্লাহ-প্রদত্ত বিরাট নিয়ামত। বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হল, আল্লাহর এই সব নিয়ামত থেকে উপকৃত হওয়া এবং সাথে-সাথে তাঁর কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করা। (আলাতে জাদিদাহ, পৃ. ২৫, মুদ্রণ, করাচী ১৩৮১ হি:)

হযরত মাওলানা জফর আহমদ উসমানী (রহঃ) তৎকালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"শত্রুর মোকাবিলার জন্য সমর শক্তি এই পরিমাণ বাড়ানো উচিৎ যার দ্বারা শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চার হয়। পূর্ব যুগের খলীফা ও সুলতানগণ এই নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছেন। হযরত উসমান (রাযিঃ) এর খিলাফতকালে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) পাঁচশত নৌ জাহাজের একটি সমরিক নৌবহর তৈরি করেছিলেন। শত্রুর সামরিক আক্রমন মোকাবেলা করার সামান নিজেরাই তৈরি করতেন। পরনির্ভরশীল ছিলেন না, যেমন আজ আমরা অন্যের মুখাপেক্ষী। সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অস্ত্র তৈরির কারখানা নির্মাণ করতে হবে। নতুন কিছু আবিষ্কারও করতে হবে। এগুলো আল্লাহর বাণী .... وَاَعِدُّوْا لَهُمْ (আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য, যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্যে থেকে) এর অন্তর্ভূক্ত। (মাসিক আল বালাগ, জুমাদাল উলা, ১৩৮৭ হি. পৃ. ৪৪)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী (রহঃ) মাসিক 'বায়্যিনাত' এর এক সংখ্যায় লিখেছেন : "মুসলিম বিশ্বে বিশেষত আরব রাষ্ট্রসমূহে প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও মাল-দৌলতের কমতি নেই, বরং অনেক উদ্বৃত্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের সম্পদের এক বিরাট অংশ হয়ত বিদেশী ব্যাংকে জমা হওয়ার কারণে ইসলামের শত্রুরাই উপকৃত হচ্ছে, নতুবা রাজকীয় ব্যয়, বিলাসিতা প্রভৃতি কাজে নষ্ট করা হচ্ছে। অথচ তাদের সামরিক শক্তি, সামরিক প্রশিক্ষণ, অস্ত্র তৈরি একেবারে শূণ্যের কোঠায়। ইসলামের শত্রুরা জায়গায় জায়গায় বিমান ঘাঁটি, নৌ ঘাঁটি, সামরিক ঘাঁটি এবং অস্ত্র তৈরির বিরাট-বিরাট কারখানা নির্মাণ করে রেখেছে। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব আজ আল্লাহকে বিস্মৃত হওয়ার পাশাপাশি বাহ্যিক আসবাব থেকেও অমার্জনীয় ঔদাসীন্য দেখাচ্ছে।" (মাসিক বায়্যিনাত করাচী, রবিউস সানী ১৩৮৭ হি. পৃ. ৪)

হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেব, এক বক্তৃতায় এটাকে আরো সুস্পষ্ট করে বলেন, "আমরা ইউরোপ থেকে কেবল কুকর্ম ও অসভ্যতা শিখেছি। তারা মিনিটে বিমান তৈরি করে। অসংখ্য বোমা ও রকেট তৈরি করে। ইহুদীদের রক্ষার জন্য কোটি কোটি ডলার জমা করে। আর আমরা আত্ম-বিলাসিতায় মত্ত। সম্মিলিত উদ্দেশ্যকে ভুলে গেলে পরিণামে পতন ছাড়া আর কী হবে"। (মাসিক আল হক, জুলাই ১৯৬৭ ইং, পৃ. ১৭)

হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব আফগানী (রহঃ) তৎকালে 'তারাক্কী আওর ইসলাম' নামক এক প্রবন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পর লিখেছেন, "ইসলামকে ছেড়ে দেওয়ার পরিণতিতে আমরা অধপতিত এবং প্রগতির সুফল হতে বঞ্চিত। নয়তো ইসলাম ও প্রগতি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। .... এই আয়াতের ভাষ্য মোতাবেক সমগ্র মুসলিম জাতির উপর ফরয হল, যাবতীয় আধুনিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এতটুকু অগ্রসর হতে হবে, যাতে খৃষ্টান জাতিকে পিছনে ফেলতে না পারলেও কমপক্ষে তাদের বরাবর থাকা যায়। মুসলিম বিশ্বকে এর জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে হবে।" (মাসিক আল-হক, সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ ইং পৃ. ২২)

আলেমগণের মাঝে শীর্ষস্থানীয় কতিপয় বুযুর্গের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হল, যা এই মুহূর্তে মনে পড়ল। যারা এসব বুযুর্গের লেখা পড়ে থাকেন তাদের নিকট এটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আলেমগণ কখনো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরোধিতা করেন নি। বরং সর্বদা তারা মুসলমানদেরকে এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এতদ সত্ত্বেও এক শ্রেণীর লোক রাত-দিন আক্ষেপ করছেন – আলেমগণ উন্নতির বিরোধী; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে তাদের বৈরী সম্পর্ক; যুগ চাহিদাকে তারা গুরুত্ব দেন না; যাবতীয় নতুন আবিষ্কারের তারা শত্রু।

মিথ্যার সবচেয়ে সুচতুর প্রচারক গোয়েবলস সত্যই বলেছিলেন যে, মিথ্যাকে যদি খুব জোরালোভাবে প্রচার করা যায়, তাহলে পৃথিবী তাকে এক সময় সত্য বলে গ্রহণ করে নিবে। আমাদের প্রগতিবাদী শ্রেণী মনে হয় গোয়েবলসের এই ভাষ্যের উপর আমল করছেন। ফলে আজ অনেক

শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও এই শ্লোগানকে সত্য মনে করছেন। অথচ এটা ডাহা মিথ্যা, যার থেকে বড় কোন মিথ্যা নিকট অতীতে আবিষ্কার হয়নি।

তবে যদি তারা নাচ, গান, অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা, বেপর্দা, উচ্ছৃঙ্খলতা, সহশিক্ষা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সূদী ব্যাংক ব্যবস্থা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়গুলোকে যুগ-চাহিদা এবং উন্নতি-অগ্রগতির মাধ্যম মনে করেন, তাহলে অবশ্যই আলেমগণ এগুলোর সুস্পষ্ট বিরোধী। এ বিরোধীতা করা তাদের কর্তব্য ছিল এবং এখনও করছেন ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন। কিন্তু দয়া করে বলুনতো বিবেকের কোন যুক্তি এগুলোকে যুগ-চাহিদা ও অগ্রগতির মাধ্যম বলে আব্যস্ত করে।

যারা এগুলোকে যুগ-চাহিদা বলে দাবী করেন তাদেরকে আমরা চ্যালে করছি। কোন যুক্তিগ্রাহ্য দলিলসহ প্রমাণ করুন, নাচ-গান আর বস্তুগত উন্নয়নের মধ্যে কোন্ সম্পর্ক বিদ্যমান ? কোন অগ্রগতিটা অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনা ছাড়া বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে ? বেপর্দা আর সহশিক্ষার দ্বারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কি সহযোগিতা হচ্ছে ? সূদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করলে অর্থনৈতিক উন্নতিতে কী বাধা সৃষ্টি হয় ?

আপনারা নাচ-গান, বেপর্দা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা মেশা ইত্যাদি বিষয়কে যুগ-চাহিদা বলছেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে, মুসলিম বিশ্ব যুগ-চাহিদা থেকে এগুলোকে সমূলে উৎখাত করাই আজ সময়ের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। কারণ, এগুলোর ধ্বংসাত্মক পরিণতি এই বিংশ শতাব্দিতে যে পরিমাণ বেড়েছে, তা পূর্বে কখনো ছিল না। যাদের অনুকরণের আশায় আপনারা এগুলোকে সময়ের দাবী ভাবছেন, সেই পশ্চিমা প্রভুরাই আজ এই বোকামির জন্য অনুতপ্ত ও পেরেশান। এ সব বস্তুর ধ্বংসাত্মক পরিণতির কারণে আজ পশ্চিমা চিন্তাবিদদের মাঝে যে আর্তচিৎকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তা পৃথিবীর কোন শিক্ষিত সমাজের কাছেই অজানা থাকার কথা নয়। সুতরাং এবার আপনারাই ফয়সালা করুন, সময়ের দাবী কোনটি ? মুসলিমবিশ্ব পশ্চিমাদের অনুসরণ করে ধ্বংসের সেই অতল গহ্বরে গিয়ে পড়বে ? না-তাদের ভয়াবহ পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে চিরদিনের জন্য এই পথ থেকে তাওবা করবে ?

পশ্চিমা সভ্যতার এই অভিশপ্ত বিষয়গুলোকে যুগ-চাহিদা ও উন্নয়নের উপকরণ হওয়ার দাবিদাররা নিজেদেরকে প্রগতিবাদী বলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তারা চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের সেই পুরনো দর্শন প্রচার করছেন, যা তাদেরকে ঝলসে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই উপহার দেয়নি। যাদের দৃষ্টি চলমান অবস্থার উপর নিবদ্ধ তারা ভাল করেই জানেন যে, পুরনো দর্শনের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের চিন্তা-গবেষণা কত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের নতুন গবেষণা সে বিষয় সম্পর্কে কী প্রমাণ করছে? উদাহরণ স্বরূপ জনসংখ্যার বিষয়টিই ধরুন না। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের এক বিরাট অংশ আজ জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। তাদের অকাট্য ও শক্তিশালি দলিলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এর স্বপক্ষের অর্থনীতিবিদের সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু আমাদের প্রগতিবাদী ভাইয়েরা এখনো সেই বাসি-পুরনো দর্শনকে বুকে আকড়ে ধরে আছেন। অথচ যুগ এটাকে পিছনে ফেলে দুশো বছর সামনে অগ্রসর হয়ে গেছে।

আমাদের প্রগতিবাদী ভাইয়েরা নাচ-গান, বেপর্দা, সহ-শিক্ষা এবং পশ্চিমা সংস্কৃতিকে অগ্রগতির সোপান মনে করেন, আর মোল্লাদের শিক্ষাকে মনে করেন অনগ্রসরতা ও স্থবিরতা। কিন্তু আল্লামা ইকবাল কী বলেন মনোযোগ দিয়ে শুনুন ঃ

قوت مغرب نہ از چنگ و رباب — نے ز رقص و دختران بے حجاب
نے ز سحر ساحران لالہ روست — نے ز عریاں ساق و نے از قطع موست
محکمی او را نہ از لا دینی است — نے فروغش از خط لاطینی است
قوت افرنگ از علم و فن است — از ہمیں آتش چراغش روشن است

حکمت از قطع و برید جامہ نیست
مانع علم و ہنر عمامہ نیست

নগ্ন উরু প্রদর্শনীর যাদুতে বাড়ে নি অগ্রগতি,
দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে আসেনি উন্নতি।
ধর্মহীনতায় পায়নি তারা এই সাফল্য,

ইংরেজী অক্ষরেও নেই কোন যাদু মন্ত্র।
পশ্চিমা উন্নতি এসেছে কেবল তাদের জ্ঞান-বিদ্যায়,
আজ তারা মহাধনী মোদের ছেড়ে দেয়া পেশায়।
শার্ট-প্যান্ট-টাই পরার নাম নয় প্রগতি,
দাড়ি-টুপি-পাগড়ী নয় জ্ঞান বিজ্ঞানের বিরোধী।

এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আমাদের প্রগতিবাদী ভাইয়েরা উলামায়ে কিরামের উপর যুগ-চাহিদা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরোধিতার যে অপবাদ দেন, তার ভিত্তি কী ? এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, প্রগতিবাদীগণ এই সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথাটা কেন এত হৈ চৈ করে প্রচার করেন ? এর পিছনে মূল কারণতো তারাই ভাল জানেন। আমাদের ধারণা, এই প্রপাগান্ডার যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে এর পিছনে মূলতঃ একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা কাজ করছে। আমাদের প্রগতিবাদী ভাইদের প্রথম ভুল হচ্ছে, তারা ইসলামকে ঈসায়ী (খৃষ্টান) ধর্মের উপর এবং মুসলিম বিশ্বকে পাশ্চাত্য বিশ্বের সাথে তুলনা করছেন। তারা দেখেছেন যে, ইউরোপের পুনর্জাগরণের সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ঈসায়ী ধর্ম ও তাদের পাদ্রীগণ। ইউরোপের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল ততক্ষণ সমগ্র ইউরোপ মুর্খতার অন্ধকারে ছিল আচ্ছন্ন। তারা তাদের নেতৃত্বের যুগে জনসাধারণের মাঝে শিক্ষা-সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গড়ে উঠা সকল আন্দোলনকেই জোর পূর্বক দমন করার চেষ্টা করেছে। জানহাস ও জেরুমের মত লোকদেরকে কন্সটান্স শহরে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নতুন-নতুন পথ উন্মুক্ত করার অপরাধে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু, ক্রমান্বয়ে চতুর্দিক থেকে এই জাগরণের প্রতিধ্বনি উঠতে থাকে। কোন বাধাই তাদেরকে ফেরাতে পারে নি। অবশেষে মার্টিন লুথার, জান কালুন, জুইংলি প্রমুখ ব্যক্তিগণ সাহস করে পোপের এই জগদ্দল পাথর রাস্তা থেকে অপসারণ করেন। সুযোগ করে দেন এই বিপ্লবের প্রচার-প্রসারের। পরবর্তী যুগে রুশো, হারনিক, রেনান প্রমুখ আধুনিক পন্থীরা ধর্মের ভিতর ব্যাপক

পরিবর্তন সাধন করে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে তাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেন।

এখন পরিস্থিতি এমন যে, পশ্চিমা ধর্ম ভীরু সম্প্রদায়ের মাঝে লুথার, কালুন, রুশো, হারনিক প্রভৃতি মনীষীগণ সংস্কারক হিসেবে পরিচিত। তাদেরকে জাতির কান্ডারী মনে করা হয়। নতুন প্রজন্মের মাঝে যারা ধর্ম থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, তারাও তাঁদেরকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। কারণ, তারা ঈসায়ী ধর্মে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত করে জাতিকে পোপীয় আগ্রাসন থেকে মুক্তি দিয়েছেন, যা উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল।

মুসলিম বিশ্বের আধুনিকপন্থীরা ইসলামকে ঈসায়ী ধর্মের সাথে তুলনা করে তার মাঝেও সেই ধরণের পরিবর্তন করতে চান। তারা ইসলামকে ঈসায়ী ধর্ম, আলেমদেরকে পোপ এবং নিজেদেরকে লুথার-রুশোর স্থলাভিসিক্ত বলে মনে করেন। এ ধারণার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে তাঁরা আলেমগণের বিরোধিতা করে এই উম্মতের সংস্কারক (Reformers) হতে চান। তাঁদের ধারণা, খুব শীঘ্রই রাজা অষ্টম হেনরীর মত কেউ আত্মপ্রকাশ করবে এবং তাঁদের দর্শনকে সরকারীভাবে গ্রহণযোগ্যতার সনদ দিয়ে স্থায়ী ভাবে কার্যকর করা হবে। আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁদের এই কৃতিত্বের কারণে তাদের প্রতি এমনভাবে ফুল বর্ষণ করবে, যেমন বর্তমান ইউরোপিয়ান প্রজন্ম লুথার, কালুন, ঝৃঙ্গলী, রুশো, হারনিক এবং রেনানের উপর বর্ষণ করছিল।

কিন্তু আমাদের ধারণা, তাঁরা মারাত্মক ভুলের শিকার। তাদের এই স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়িত হবে না। তারা ইসলামকে ঈসায়ী ধর্মের উপর এবং আলেমগণকে পোপদের সাথে তুলনা করে মারাত্মক ভুল করেছেন। ঈসায়ী তৃতীয় শতাব্দির পর ঈসায়ী ধর্মে যে অপ্রাকৃতিক ধারণা ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল তাতে তার মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আগত যুগের দাবী মিটানোর ক্ষমতা আদৌ ছিল না। শক্তি ছিল না যুগের নতুন-নতুন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে দৃষ্টি মেলানোর। তা ছিল অজ্ঞতা আর কল্পনা-পূজার ঘোর অন্ধকার। বিজ্ঞানের আলোর সম্মুখে দাঁড়ানোই সম্ভব ছিল না তার। এ কারণে বিজ্ঞান তার সামনে এক ভয়াবহ বিপদ হিসেবে উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় তাদের সামনে কেবল দুটি পথই উন্মুক্ত ছিল, হয় বিজ্ঞানের বিরোধিতা করা, নয়তো

ধর্মের পরিবর্তন সাধন করা – যাতে সেটা বিজ্ঞানের নতুন ধারণার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। তাদের পোপগণ প্রথম পথ অবলম্বন করে বিজ্ঞানকে নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু বিজ্ঞান ছিল সে যুগের বাস্তব চাহিদার বস্তু। দলিল ব্যতীত কোন দাবী এই পথকে বন্ধ করতে পারছিল না। ফলে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই প্রেক্ষাপটে আধুনিক পন্থীরা দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করে ধর্মের পরিবর্তন শুরু করেন। তাঁরা ধর্মকে কেটে ছিঁড়ে এতটুকু উপযুক্ত করেছেন যে, অন্তত আধুনিক যুগের মানুষের কাছে সেটা হাস্যকর বস্তুতে পরিণত না হয়। নিঃসন্দেহে এটা ঈসায়ী ধর্মের উপর তাদের বিরাট অনুগ্রহ ছিল। তাঁরা যদি এই অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে এই ধর্ম যুক্তিবাদীতার (Rationalism) সয়লাবে মুখ থুবড়ে পড়ত এবং আজ তার কোন নাম গন্ধও অবশিষ্ট থাকত না। খৃস্টান আধুনিকপন্থীদের নৈপূণ্যে খৃষ্টান ধর্মের লাভ এতটুকু হল যে, মৌলিক দর্শন ও বিধান সম্পূর্ণ পরিবর্তন হলেও অন্তত তার নামও বাহ্যিক অবয়বটা আজও অবশিষ্ট রয়েছে। ঈসায়ী ধর্মের উপর আধুনিকপন্থীদের এই অবদানই তাঁদেরকে খৃষ্টান জাতির হিরো বানিয়ে দিয়েছে এবং এই কারণেই খৃষ্টান বিশ্বের অনেকে তাদেরকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে।

কিন্তু ইসলামের ব্যাপারটি এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটা প্রকৃতির ধর্ম এবং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার জন্যই এর আবির্ভাব। এর মৌলিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসমূহ প্রত্যেক যুগের গবেষণালব্ধ ফলাফলের সাথে তাল মিলিয়ে চলার পূর্ণ যোগ্যতা রাখে। তাই বিজ্ঞান তার জন্য কোন শঙ্কার কারণ হয়নি এবং হবেও না। বরং আমরা তো দেখছি, বিজ্ঞানের নতুন-নতুন আবিষ্কার তার প্রতি বিশ্বাস ও তার শিক্ষাকে আরো পরিচ্ছন্ন ও দ্বিধামুক্ত করে দিচ্ছে। তাই বিজ্ঞানের বিরোধিতা করার প্রয়োজন এ ধর্মে নেই এবং এতে কোনরূপ পরিবর্তন করারও দরকার নেই। এই কারণে, আলেমগণ পাদ্রীদের ন্যায় বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেননি। কারণ তারা ভাল করেই জানেন যে, মানবীয় জ্ঞানের পরিধি যতই বাড়বে, ইসলামের বর্ণিত দর্শন ততই প্রস্ফুটিত হবে। মুসলিম মিল্লাত যেহেতু এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, ইসলাম আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম; সুতরাং কোন যুগেই তার পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। এ জন্য

তাঁরা সর্বদা এই ধর্মে কোন ধরণের পরিবর্তনের চেষ্টাকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন।

সার কথা হল, ইসলাম খৃষ্টান ধর্মের ন্যায় নিষ্প্রাণ ধর্ম নয় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে সে শঙ্কিত হবে। এবং ইসলামের আলেমগণ পোপদের ন্যায় কখনো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরোধিতাও করেননি। এই ধর্মের স্থায়িত্বের জন্য কোন মার্টিন-লুথার বা রুশো-রেনানেরও প্রয়োজন নেই। এ কারণে এই ধর্মের ইতিহাসে যত লোক সংস্কার বা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাদের ভাগ্যে নিন্দা আর অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই মিলেনি। যারা সংস্কার এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধনের আন্দোলন উঠিয়েছিলেন, এই ধর্মের ইতিহাসে তাদেরকে লুথার বা কালুন বলা হয়নি। আমাদের ইতিহাসে সংস্কার পন্থীদের নাম মুসায়লামা, আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা, আবু মুসা মুঝদার, হাসান ইবনে সাবাহ, কারামত, আবুল ফযল, ফয়যী, কামাল আতাতুর্ক প্রমুখ। এখন যাদের বংশধররা নিজেদেরকে তাদের উত্তর-পুরুষ বলে দাবী করতেও লজ্জাবোধ করে। খৃষ্টান জগতে আজ লুথার ও কালুনের বিরোধিতাকারীদের নাম অত্যন্ত ঘৃণার সাথে নেয়া হয়। কিন্তু ইসলামী ইতিহাসে সংস্কারবাদীদের বিরোধিতাকারী আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ), আলী ইবনে আবি তালিব (রাযিঃ), আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ), মাহমুদ গজনবী (রহঃ), এবং মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) প্রমুখ মনীষীর নাম আজও অম্লান হয়ে আছে। মানব-হৃদয় যতদিন জীবিত আছে এসব মহান ব্যক্তিদের উপর ভালবাসার ফুল ততদিনই বর্ষিত হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। দুঃখ হল, আমাদের বর্তমান আধুনিকপন্থীরা ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের এই বিরাট পার্থক্যটি বুঝতে পারছেন না। এই ভুল ধারণার কারণে আলেমগণকে গালমন্দ করতে, তাদের বিরোধিতা করতে এবং তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে তারা ব্যস্ত। আমরা পূর্ণ আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতার সাথে তাদের খেদমতে নিবেদন করছি, তাঁরা যেন ঠান্ডা মাথায় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করেন। নয়তো তাঁরা যে রাস্তা অবলম্বন করেছেন; তা আদৌ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এবং দেশ ও জাতির জন্য এমনকি তাদের নিজের জন্যও মঙ্গলজনক নয়।

Contents

ব্যাখ্যার নামে অপব্যাখ্যা

বর্তমান যুগে এমন অসংখ্য ফেকহী সমস্যার সূচনা হয়েছে যেগুলো সমাধান করতে দ্বীন সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্যের অধিকারী তাকওয়ার অনুসারী আলেমগণকে সম্মিলিতভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এর মধ্যে এমন কিছু মাসআলাও রয়েছে; ইসলামের সর্বসম্মত মূলনীতির আলোকে সেগুলোর সমাধান বের করার জন্য আলেমে দ্বীন ও বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের একত্রে বসতে হবে এবং বর্তমান যুগে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে যে সব সমস্যা সামনে আসছে সম্মিলিতভাবে সেগুলোর সমাধান পেশ করতে হবে।

আলেমগণ এই মহান কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব দীর্ঘ দিন হতে অনুভব করছেন। বিভিন্ন জায়গায় এই উদ্দেশ্যে কাজও চলছে। কিন্তু উপকরণের স্বল্পতার কারণে এই সব প্রচেষ্টা এখনো কোন সুসংগঠিত ও সম্মিলিতরূপ লাভ করেনি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই গুরত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করে। আমাদের বর্তমান সংবিধানের ২০৭ ধারায় এই সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, এই সংস্থার মাধ্যমে ইসলামী বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা পেশ করা হবে এবং সমাজকে সঠিক ইসলামী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান তার লিখিত আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ

"আমি ইসলামী মূলনীতির জন্য একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল এবং ইসলামী গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি। তারা আমাদের সাংবিধানিক বিষয়গুলোকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে ইসলামী ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত করতে আইন প্রণেতাদের সহযোগিতা করবেন। কিন্তু এই আইন বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সমাজের যুগ চাহিদার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখা প্রয়োজন।"

(ফ্রেন্ড নট মাস্টার্স, পৃ. ১০৬ অষ্টম অধ্যায়)

Contents

এই উদ্দেশ্যটি মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না। এটাতো আলেম-উলামা ও ইসলাম প্রিয় মানুষের মনের একান্ত বাসনা। এটা ছাড়া দেশের প্রচলিত পুরাতন সংবিধান বাতিল করে তাকে ইসলামী আইনে রূপান্তর করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান যত ভাল নিয়্যত ও উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিষ্ঠা করা হোক, কেবল তখনই তা কোন সুফল বয়ে আনতে পারে, যখন তার কার্যপ্রণালী হয় সঠিক; তার পরিচালকগণ সমস্যা ও তার সমাধান-সম্পর্কিত মাসআলাটি নিয়ে সুস্থ বিবেকে চিন্তা করার যোগ্যতা রাখেন, কাজের একটি যুক্তিসঙ্গত ও সুপরিকল্পিত ছক থাকে তাদের মস্তিস্কে এবং গন্তব্যে পৌছার জন্য তারা যে পথ অবলম্বন করেছেন তা সঠিক ও সহজ হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই শর্তগুলো পুরো-পুরি পালিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এহেন কোন প্রতিষ্ঠানের সফলতা আশা করা যায় না।

এ কারণে 'ইসলামী গবেষণা সংস্থা' এখন পর্যন্ত তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি। এর প্রতিষ্ঠার পর অনেক বছর অতীত হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন ভাল কাজ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, বরং এর কারণে দেশে অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খলার এক দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

এটা না বললে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয় যে, এ পর্যন্ত এ সংস্থা কোন বিষয়ের সমাধান করার পরিবর্তে সমস্যাগুলোকে আরো জটিল করে তুলেছেন। সামাজিক সমস্যা দূরীভূত করার পরিবর্তে সমস্যা আরো বৃদ্ধি করেছেন। বিশৃঙ্খলা দমনের পরিবর্তে ফিত্নাকে আরো উসকে দিয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র-বিন্দু হওয়ার কথা আজ পর্যন্ত সে জাতির সামান্যতম আস্থাও লাভ করতে পারে নি। অমূলক আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পাকিস্তানের দশ কোটি মুসলমানের বুক চিরে দেখুন; বুঝতে পারবেন, তারা এই প্রতিষ্ঠানকে নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করে না। তার কর্মকাণ্ড কাঁটার মত তাদের অন্তরে গিয়ে বিঁধে। তার প্রতি মানুষের অনাস্থা এই পরিমাণ যে, যদি এই সংস্থা দু একটা নির্ভুল কথা উচ্চারণ করে, তবুও তা মানুষের দৃষ্টিতে সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে।

এখানে সংক্ষিপ্তভাবে সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো একটি অতি উপকারী প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে এবং যাকে কেন্দ্র করে দেশে ঐক্যবদ্ধ-সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা এবং ঝগড়া-ফাসাদের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়টি কারো জিদ, হঠধর্মীতা কিংবা ব্যক্তিগত মান মর্যাদার নয়। বরং এটি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উপর এদেশে ইসলামী কালচার ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এটাকে পূর্ণ নিষ্ঠা এবং সঠিক চিন্তাধারার আলোকে সমাধান করা না-গেলে জাতি কখনো তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। তাই সংশ্লিষ্ট সকলকেই আবেগ উচ্ছাসের উর্ধ্বে থেকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত স্থীর ও সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করা আজ সময়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দাবী।

আমাদের মতে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, এর কর্মকর্তাগণ আধুনিক জীবনধারার বিষয়গুলির সমাধান খুঁজতে গিয়ে 'তাহকীক' সত্যানুসন্ধান এবং 'তাহ্‌রীফ' বিকৃতকরণ এর মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারেন নি। তাঁরা সত্যানুসন্ধানকে বিকৃতকরণের সমার্থক মনে করে এমন স্থুল সমাধান বের করেছেন, যা কোনক্রমেই ইসলামী বিধানের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়।

বর্তমান যুগের ইসলামী চিন্তাবিদগণের ধর্মীয় দায়িত্ব ছিল, এ বিষয়ে গবেষণা করে দেখা যে, বিংশ শতাব্দির মানুষের সামনে যে সব সমস্যা উপস্থিত হচ্ছে সে বিষয়ে ইসলামের মূল হিদায়াত কী? এবং কিভাবে সেগুলোকে বাস্তবায়িত করা যায়। কার্যক্ষেত্রে যদি কোন সমস্যা থাকে তাহলে তা কি করে দূর করা যায়। তাদের উচিৎ ছিল পাশ্চাত্য জীবন ধারার অন্ধ অনুকরণ প্রিয়তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যালোচনা করা। এর মাঝে যেটি ইসলামী বিধানের পরিপন্থী নজরে পড়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করে মুসলমানদের জন্য এমন বিকল্প পন্থা উদ্ভাবন করা যা ইসলামী বিধানের মূলনীতি অনুযায়ী হবে, এবং আধুনিক যুগ চাহিদারও প্রয়োজন পূরণ করবে।

কিন্তু ইসলামী গবেষণা পরিষদের চিন্তাবিদদের কর্মপন্থা এর সম্পূর্ণ উল্টো। প্রথমত তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, তেরশ বছরের পূর্বের ইসলামী বিধান (মাআযাল্লাহ) বর্তমানে পুরনো হয়ে গেছে। সুতরাং কিছু মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া বর্তমানে তার উপর কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয়। (এই পরিবর্তনকে তাঁরা 'নতুন ব্যাখ্যা' বলেন)। দ্বিতীয়ত, তাঁদের মস্তিষ্কে পুরোপুরি বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের পুরোটাই কল্যাণকর ও বরকতময়। সুতরাং মুসলমানদের সেটা পুরোপুরি অনুসরণ করা ছাড়া বর্তমান পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

অতএব এ দুটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে তাদের আধুনিকতা প্রীতির চিন্তাধারা। এ কারণে তাঁদের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে; পাশ্চাত্য থেকে আগত কোন থিওরি বা কার্যপ্রণালী দেখলে প্রথমেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, এটা শতভাগ নির্ভুল। চলমান যুগে এটা গ্রহণ ব্যতীত বিকল্প নেই। তারপর তাঁরা এটাকে যে করেই হোক ইসলামী বিধান অনুযায়ী প্রমাণ করার জন্য তাদের গবেষণা কর্মের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন বরং বলতে গেলে বলতে হয় যে তারা ইসলামকে এর অনুরূপ বানাতে চেষ্টা করেন। এতে ইসলামের সর্বসম্মত বিধান পরিবর্তিত হোক কিংবা হাদীস ও সুন্নাহকে অস্বীকার করা হোক বা কুরআনে কারীমের আয়াতের অর্থ পরিবর্তনের জন্য নতুন অভিধান রচনারই দরকার হোক তা করতে তারা কোন পরোয়া করেন না।

আমাদের মতে এহেন কর্মের জন্য 'গবেষণার' পরিবর্তে 'বিকৃতি' শব্দের ব্যবহার হওয়া উচিৎ। আমাদের নিবেদন, আপনি যদি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম, ইসলামের বিধানাবলী মানব-রচিত নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানবতার যাবতীয় প্রয়োজন সম্পর্কে যিনি পূর্ণ জ্ঞাত – সেই মহান প্রজ্ঞাবানের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট, যদি আপনার পূর্ণ আস্থা থাকে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আনীত ইসলামে কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত সকল বিষয় ও সমস্যার যুক্তিপূর্ণ সমাধান বিদ্যমান; তাহলে আপনাকে মানতেই হবে যে, বিংশ শতাব্দির সমস্যার সমাধানও ইসলামের সেই মূলনীতিতে বিদ্যমান যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশত বছর পূর্বে নিয়ে এসেছিলেন। শর্ত হল, যে হীনমন্যতা আপনার দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যকে সত্যের মাপ কাঠি বানিয়ে রেখেছে, তা থেকে মুক্ত হতে হবে। সাহস করে একবার মাথা থেকে কোনভাবে পাশ্চাত্যানুকরণের মনোবৃত্তিকে সরিয়ে ফেললে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ হবে। তারপর বর্তমান যুগে বেঁচে থাকার এমন পথ দৃষ্টি গোচর হবে, যা পাশ্চাত্যের সর্বনাশা পথ থেকে ভিন্ন এবং বর্তমান যুগ-চাহিদারও পরিপূরক। আর এ পথে চলে আপনি গভীর প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তির এমন দৌলত লাভ করবেন, যা পাশ্চাত্যবাসী কখনো কল্পনাও করেনি।

আমাদের কথাগুলো আপনাদের কাছে তিক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু আপনাদের অভিধানে 'সত্যানুসন্ধানের' কোন অর্থ থাকলে বিবেকটাকে একটু প্রশ্ন করে দেখুন। সে সাক্ষ্য দিবে, কোন বিষয়ের সমাধান খোঁজার সময় পশ্চিমাদের পক্ষ হতে পশ্চাদগামীতার অভিযোগ উত্থাপিত হয় কিংবা তারা আমাদেরকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিংবা অসভ্য বলে বসে এই চিন্তা আপনাদেরকে ঘিরে রাখে। আর এই আশংকাই আপনাদেরকে ইসলামী দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে দিচ্ছে না। আর পাশ্চাত্যের পক্ষ হতে যে সব বিষয় 'প্রগতিবাদ' বলে আখ্যা মিলেছে সেসব বিষয়কে 'ইসলাম' বলে প্রমাণ করার মাঝেই আপনারা কল্যাণ নিহীত বলে মনে করছেন।

এ কাজের জন্য পশ্চিমাদের মধ্যে হয়ত আপনার কোন সুনাম হাসিল হতেও পারে। কিন্তু এ ভাবে আপনার সমস্যার সমাধান কখনো হবে না। এক স্বাধীন ও জীবন্ত জাতির অধিকারও লাভ করতে পারবেন না এভাবে। তদুপরি আপনাদের এটাও ভেবে দেখা উচিৎ যে, অন্যকে খুশি করার জন্য নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

আমরা আপনাদের কর্মপন্থার যে ব্যাখ্যা প্রদান করলাম তাতে যদি অতিরঞ্জিত মনে হয়, তাহলে আপনাদের কর্মসূচীর উপর এক সত্যানুসন্ধানী নিরীক্ষা চালিয়ে দেখুন। আমাদের কথার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আপনারা দেখেছেন, পাশ্চাত্য তাদের সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা সূদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এই ব্যবস্থাকে আধুনিক সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। এটুকু দেখেই আপনারা সমস্ত চিন্তাগত শ্রম এর পিছনে ব্যয় করছেন যে, কী করে ব্যবসায়িক সূদকে হালাল করা যায়। ব্যাংকিং এর জন্য সূদী ব্যবস্থার প্রয়োজন কতটুকু তা ভেবে দেখেন নি। 'মুদারাবা' -এর মূলনীতির ভিত্তিতে ব্যাংক কেন চালানো হয় না ? আপনারা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে 'ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সূদ' এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। অথচ পাশ্চাত্যের বিরোধিতা করে সূদমুক্ত ব্যাংকিং এর সেই মূলনীতি উদঘাটন করতে পারলেন না, যার দ্বারা সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত এবং কার্যকর হয়।

আপনারা দেখেছেন, পাশ্চাত্যে ইন্সুরেন্সকে সভ্যতার আলামত মনে করা হয়। সাথে-সাথেই আপনারা তা চোখ বুজে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর ইসলামকে সেই অনুযায়ী প্রমাণ করার জন্য কুরআন ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা শুরু করে দিয়েছেন। অথচ আপনারা এতটুকু চিন্তা করলেন না যে, ইন্সুরেন্সের প্রচলিত ব্যবস্থায় সামান্য পরিবর্তন করলেই তা কেবল ইসলামের সর্বসম্মত মূলনীতি মুতাবেকই হতো না বরং অধিক কল্যাণকরও প্রমাণিত হতে পারত।

আপনারা পশ্চিমাদের পরিবার পরিকল্পনাকে (জন্ম নিয়ন্ত্রণকে) উৎসাহ দিতে দেখেছেন। তারপর নিজেরাও তার প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। আর কুরআন ও সুন্নাহর যে সুস্পষ্ট বিধান এর পরিপন্থী দেখেছেন, তার মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন। কিন্তু একথা কখনো ভাবেননি যে, চীন সত্তর কোটি জনবসতি নিয়ে কী করে জীবিত আছে ? জন্ম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তারা এত অল্প সময়ের ভিতর এত বড় অর্থনৈতিক সাফল্য কিভাবে লাভ করল ? মি. চু ইং লাই -এর ভাষ্যমতে এখনো প্রতিটি নতুন শিশু তাদের জন্য আনন্দের বার্তা কেন বয়ে আনে ?

পশ্চিমাদের শোর-গোলে আপনারা শুধু নবজাতকের মুখ দেখেই অস্থির হয়ে পড়েছেন – এর খাবার আসবে কোথা হতে ? কিন্তু তার হাত দুটি দেখলেন না। এর গুরুত্বের কথা চিন্তা করেই ইসরাইলের মত ক্ষুদ্র দেশ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির নীতি চালু রেখেছে। পাশ্চাত্য বলল, অধিক জনবসতি উন্নয়নশীল দেশের জন্য ক্ষতিকর। তাদের এই পরামর্শ কবুল করে আপনারা পরিবার পরিকল্পনাকে (জন্ম নিয়ন্ত্রণকে) জরুরী বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কখনো ভাবেননি, ভিয়েতনাম আমেরিকার হিংস্র ছোবলে কিভাবে কাতরাচ্ছে? চীনের অস্তিত্ব কেন পশ্চিমাদের জন্য দুঃস্বপ্ন ? আমেরিকা শ্লোগান দিয়েছিল, এশিয়ার যে দেশগুলোতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কার্যকর আছে সে দেশগুলোকে সাহায্য দিবে। আপনারা ভেবেছিলেন, তারা আমাদের হিতাকাঙ্খী হিসেবে একথা বলেছে। কিন্তু ইসরাইলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কার্যকর না-থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা তাদেরকে কেন সাহায্য দিচ্ছে সেটা কখনো ভেবে দেখেন নি।

আপনারা শুনেছেন, পশ্চিামা দেশে একাধিক স্ত্রী নিষিদ্ধ। একাধিক বিবাহ তাদের দৃষ্টিতে দূষণীয়। আপনারা নিজেদেরকে (মাআযাল্লাহ) দুর্নামের কালিমা থেকে মুক্ত করার জন্য ওজর পেশ করে বললেন, আমাদের ধর্মে এটাকে শুধু ইমারজেন্সি প্রয়োজনে জায়েয করা হয়েছিল; এখন আর এটা জায়েয নয়। এ উদ্দেশ্যে কুরআন কারীমের আয়াতে টানা হেঁচড়ার চেষ্টাও কম হয় নি। কিন্তু আপনারা ভেবে দেখার চেষ্টা করেন নি যে, পশ্চিমাদের কখনোই একাধিক স্ত্রীর প্রয়োজন কেন হয় না ? আধুনিক সভ্যতার আশীর্বাদে হোটেল, নাইট ক্লাব ও পার্কে যে 'বহু স্ত্রীর' চর্চা হয়, তাতে আইনগত দ্বিতীয় বিয়ের তাদের কীইবা প্রয়োজন ? ইউরোপীয়রা প্রচার করেছিল, একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারীরা স্ত্রীদের উপর জুলুম করে। আপনারা বললেন, জুলুম-নিপীড়ন বন্ধ করাই তো ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। তাই আপনারা ফতোয়া দিলেন, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ হারাম ! কিন্তু আপনারা ভাবেন নি, আজ অসংখ্য মানুষ এক স্ত্রীর উপরও উৎপীড়ন চালাতে দ্বিধা করছে না। বরং এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং এই দর্শন অনুযায়ী এক বিয়ে করাও নিষিদ্ধ হওয়া উচিৎ।

আপনারা দেখলেন, পাশ্চাত্যজগৎ পর্দাকে অপছন্দ করে। সুতরাং আপনারাও বেপর্দাকে জায়েয করার জন্য কুরআন-সুন্নাহর সর্বসম্মত বিধানে পরিবর্তন আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু পর্দা ছেড়ে দিয়ে আজ পাশ্চাত্যবাসী

নৈতিক অবক্ষয়ের কোন অতল গহ্বরে নেমে গেছে তা একবারও ভেবে দেখলেন না। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের অনুশোচনার কারণ কি ?

আপনারা দেখলেন, পাশ্চাত্যে সহশিক্ষা প্রচলিত। আপনারাও তাকে সভ্যতার সিঁড়ি মনে করে তার উপর আমল শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেন নি, কিনসী রিপোর্ট (Kinsey Reports)১ আমেরিকার সামাজিক যে চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে তার উপাদান কী ? আমাদের যুব সমাজের মধ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার বিস্তার এবং দিন-দিন শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ার দায়িত্ব কিসের উপর বর্তায় তাও আপনারা ভেবে দেখেন নি।

পশ্চিমাদের অনেকেই 'মুজিযা'কে কল্পনা পূজা বলে থাকেন। অতএব আপনরাও কুরআনের বর্ণিত সকল মুজিযাকে ভিত্তিহীন বলে দিলেন। পরিণামে গোটা কুরআনকেই কাব্যিক উপমা হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। কিন্তু আপনারা ভেবে দেখেন নি যে, মুজিযাকে যারা শুরুতে অস্বীকার করেছিল, তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বিশ্বাসকে (মাআযাল্লাহ্) কল্পনা পূজার সর্ব নিকৃষ্ট একটি প্রকার মনে করত; তারা 'ওহী' এবং 'রিসালাত'কে নিয়ে ঠাট্টা করত। অন্য দিকে এ চিন্তাটুকুর কষ্ট স্বীকার করেন নি যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যেসব নতুন আবিষ্কার সামনে আসছে, সেগুলো 'মুজিযা'কে কত দ্রুত মানুষের বোধগম্যের কাছাকাছি নিয়ে আসছে।

এসব বাস্তবতাকে সামনে রেখে এবার অনুগ্রহ করে বলুন তো আমাদের কথায় কতটুকু অতিরঞ্জন রয়েছে ? আপনারা কোন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করার সময় অনুসন্ধান করেন না যে, বাস্তবে এর ইসলামী ও যুক্তিভিত্তিক সমাধান কী ? উল্টো আপনাদের দৃষ্টি থাকে পাশ্চাত্যের উপর নিবদ্ধ। যে বিষয়ের বৈধতার সনদ আপনারা সেখান থেকে পেয়ে যান তাকে ইসলামী রীতি মুতাবেক প্রমাণিত করার জন্য যাবতীয় চেষ্টা তার মধ্যেই ব্যয় করেন।

---

১. আমেরিকার প্রসিদ্ধ যৌনশাস্ত্রবিদ প্রফেসর আল ফ্রাইডস কিনসি দীর্ঘ পনের বছর গবেষণার পর যে বিশ্বখ্যাত রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন, যা আমেরিকার ভয়াবহ সামাজিক অধপতনের আত্মা কাপিয়ে দেওয়ার মত দাস্তান।

এতে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে যেমন আচরণই করা হোক তাতে ভ্রুক্ষেপ করেন না। আর পশ্চিমাদের কাছে যেটা অপছন্দ, তাকে অবৈধ করতে আপনারা পুরো শক্তি প্রয়োগ করেন। তাতে যত স্পষ্ট বিধানই পদদলিত হোক তাতেও আপনাদের কিছু আসে যায় না।

পাশ্চাত্যের লোকেরা যে সব বিষয় আলোচনায় এনেছে এখন পর্যন্ত আপনারা সেগুলোকেই আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত রেখেছেন। অথচ আমাদের সমাজের যে অসংখ্য বিষয় জরুরী ভিত্তিতে সমাধান করা প্রয়োজন, সেগুলোর প্রতি আপনাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। এর সুস্পষ্ট উদাহরণ : একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারীরা তাদের স্ত্রীদের উপর যে বে-ইনসাফি করে তা আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। অথচ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের কারণে সংঘঠিত অত্যাচারের ঘটনা আমাদের সমাজে বিরল। কিন্তু অন্য ধরণের উৎপীড়ন থেকে কোন পরিবার, গ্রাম বা এলাকা মুক্ত নয়। সতীনের কারণে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা আমাদের সমাজে খুবই কম দেখা যাবে। কিন্তু এমন অসংখ্য মহিলা রয়েছেন যাদের কোন সতীন নেই। তবু স্বামীর জুলুমের কারণে তাদের দাম্পত্য জীবন জাহান্নামে পরিণত হয়ে আছে। এসব মহিলার কষ্ট কি আপনাদের অন্তরে কোন ব্যাথা সৃষ্টি করে না ? তাদের অসহায়ত্বের জন্য আপনাদের হৃদয়ে কি কোন দয়া নেই ? নির্যাতনের যাতাকল থেকে তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আপনারা কি কোন চেষ্টা করতে পারেন না ?

বিবাহ, যৌতুক, মোহর, ভরণ-পোষণ এবং শ্বশুরালয়ের সম্পর্কের ব্যাপারে যে সব কু-সংস্কার আমাদের সমাজে জেঁকে বসেছে, সে ব্যাপারে কি আপনাদের কলমকে শানিত করেছেন ? আদালতের সনাতন ও ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থায় নায্য বিচার প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সে ব্যাপারে আপনারা কি আন্দোলন করেছেন ? বিবাহের ক্ষেত্রে কেবল 'একাধিক স্ত্রী'ই বড় বিষয় হয়ে দেখা দিল আপনাদের কাছে। অথচ এদের সংখ্যা আমাদের সমাজে শতকরা দশজনের বেশি নয়। আর আপনারা নিজেদের সকল সৃজনশীল যোগ্যতা তাকে নিষিদ্ধ করার পিছনে ব্যয় করছেন।

ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে দেখুন, এই গলাবাজির এছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে যে, 'একাধিক স্ত্রী' প্রসঙ্গটি পশ্চিমা জগৎ উসকে

দিয়েছে। এ কারণে আপনাদের দৃষ্টিতে এটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা পড়েছে। এবং অন্য সব প্রসঙ্গ ছিল দেশীয়। তাই তার সমাধানের কোন তাড়াহুড়া আপনাদের নেই।

আবার যে বিষয়গুলোর প্রতি আপনারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন সেগুলোর সমাধানের প্রক্রিয়াও অবলম্বন করেছেন এক অদ্ভুৎ ধরণের। সমাজে যে সব অপকর্ম সংগঠিত হয় তার গভীরে গিয়ে প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করার পরিবর্তে, আপনারা এমন স্থুল ও সহজ সমাধান পেশ করেছেন যা হাসির বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামী শিক্ষা না থাকার কারণে সাধারণের মাঝে আজ কথায়-কথায় স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার এক জাহেলী-রীতি চালু হয়ে গেছে। এই প্রথা নিঃসন্দেহে মারাত্মক ভুল এবং নাজায়েয। এর কারণে সমাজে বিভিন্ন ধরণের অনাসৃষ্টি তৈরি হয়। সুতরাং এর সংশোধনের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার ছিল যে, তিন তালাক প্রদান শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্য গুনাহের কাজ। সাথে-সাথে এরূপ জঘন্য গুনাহের কাজে লিপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া যায় কি না সেটাও ভেবে দেখা। তা না করে আপনারা এর সমাধান বের করতে যেয়ে, তিন তালাকের তিন সংখ্যাটির অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে ফেললেন। পুরুষদের সুযোগ করে দিয়েছেন, তারা যত বেশী ইচ্ছা তালাক দিলেও তিন তালাক হয়েছে বলে গৃহীত হবে না। এর উদাহরণ ঠিক এমন ঃ আপনি এক মজলুমকে মার খেতে দেখলেন। মজলুম ব্যক্তি সাহায্যের জন্য চিৎকার করলে আপনি জালেমকে বাধাও দিলেন না এবং তার জুলুমের জন্য সতর্কও করলেন না। বরং আপনি মজলুমকে বললেন, তুমি মার খেতে থাক; কিন্তু আমরা স্বীকারই করব না যে, তুমি মার খেয়েছ। মেহেরবানী করে একটু চিন্তা করে দেখুন, মজলুমকে জুলুমের হাত থেকে এভাবে বাঁচানো সম্ভব ?

আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, দাদা মারা যাওযার পর এতীম পৌত্রগণ অসহায় হয়ে পড়ে। আপনারা চাচাদের মিরাছের অংশ কমিয়ে তাদেরকে প্রদান করে অসহায়ত্ব দূর করেছেন। কিন্তু আপনাদের দৃষ্টি সামনে অগ্রসর হল না যে, এতীম ভাতিজা বা ভাগ্নেরা তাদের চাচা বা মামাদের মিরাছ থেকে

কোন অপরাধে বঞ্চিত হবে ? ভেবে দেখলেন না যে, একজনের পকেট থেকে জোর পূর্বক হাইজ্যাক করে অন্যজনের অভাব দূর করার এই পক্রিয়া সমর্থনযোগ্য কি না।

এই ধরণের অসহায়দের সাহায্যের জন্য ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রে 'কিতাবুন নাফাকাত', 'কিতাবুল ওসীয়্যাত', 'কিতাবুয্ যাকাত' বিদ্যমান। এসব বিধান সমাজে প্রচলিত হলে এই ধরণের অসহায়দের আরো উন্নত ও সুন্দর প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করা যায়।

উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি নিরপেক্ষভাবে এবং গভীর ধ্যানের সাথে যিনি চিন্তা করবেন, তিনিই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন যে, সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য ইসলামী গবেষণা সংস্থা এবং তার প্রগতিবাদী পরিচালকদের চিন্তা-গবেষণার মূল পদ্ধতি অশুদ্ধ। ফলে তারা আজ পর্যন্ত দেশ ও জাতির কোন কল্যাণ সাধন তো করতেই পারে নি, উপরন্তু দেশ জুড়ে তারা অশান্তি, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিয়েছে। হায়! এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ যদি একটু সততার সাথে ভেবে দেখতেন তারা যে পথ অবলম্বন করেছেন সেটা জাতির ঐক্যের জন্য কতটা ক্ষতিকর এবং ভয়ঙ্কর।

এ কথাগুলো কোন সম্প্রদায়িক গোড়ামির বশবর্তী হয়ে আলোচনা করিনি। আমরা যাকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং যার উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দেশের প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি – তারই এটা সুলভ হিতাকাঙ্খী অভিব্যক্তি। এই আশায় আমরা অনুরোধ করছি ঃ

انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے
شاید کہ ترے دل میں اتر جائے مری بات

বলার ঢং নয়কো যদিও চমৎকার
কারো মনে আসতে পারে চিন্তার ঝড়।

ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যা

আগের প্রবন্ধে আমরা আধুনিকপন্থীদের চিন্তাধারার একটি দিকের উল্লেখ করেছি যে, তাঁরা পাশ্চাত্যের চিন্তা ও কর্মকে আগে থেকেই সত্যের মাপকাঠির মর্যাদা দিয়ে রাখেন। তাদের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শ এবং যুক্তি-প্রমাণ সবকিছুই পাশ্চাত্য হতে ধারকৃত। যারাই আধুনিক চিন্তাধারার সাথে সম্পর্ক রাখেন তারাই পশ্চিমাদের চোখ দিয়ে সব কিছু অবলোকন করেন; তাদের চিন্তাধারার আলোকে সব কিছু ভাবেন। এ কারণে মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত অন্তর তাদের দর্শন গ্রহণ করতে পারেনি এবং পারবেও না।

এখানে আমরা তাদের চিন্তা-ধারা ও যুক্তি-প্রমাণের পন্থা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে চাই। যা আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংক্ষেপে আমরা সে সব কারণ চিহ্নিত করব, যার উপর ভিত্তি করে আমাদের আধুনিকপন্থীরা অনুসন্ধান ও তাহকীকের পরিবর্তে বিকৃত করণও তাহরীফের রাস্তায় অগ্রসর হয়েছে এবং যার কারণে তাদের চিন্তা-ধারা ও মতাদর্শের ভিত্তি দিন-দিন বেঁকে যাচ্ছে।

সামান্যতম বোধশক্তি-সম্পন্ন লোকও উপলব্ধি করতে পারেন যে, 'তাহকীক' এর উদ্দেশ্য 'সত্যানুসন্ধান'। এবং একজন তাহকীককারীর দৃষ্টিভঙ্গি হবে একজন বিচারকের ন্যায়। যার দায়িত্ব, পূর্ব হতে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত মস্তিষ্কে স্থির না করে পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা; সম্ভাব্য সকল খুঁটি-নাটি বিষয় বিবেচনায় এনে চিন্তা করা; এবং যুক্তি-প্রমাণের প্রধান্য যে দিকে বেশি মনে হবে, সে দিকেই নিজের রায় প্রদান করা। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি পূর্ব হতে সিদ্ধান্ত স্থির করে নেয়ার পর তার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে দলিল খোঁজে, তাহলে তাকে কখনো সত্যানুসন্ধানী বলা যায় না। তার অনুসন্ধানকে গবেষণাও বলা যায় না।

অন্যভাষায়, এক মুহাক্কিকের (গবেষকের) কাজ দর্শন স্থির করে তার স্বপক্ষে দলিল অনুসন্ধান করা নয়, বরং দলিল পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত বের করা। তিনি দলিলকে নিজের সিদ্ধান্তের দিকে টেনে আনেন না, দলিলই তাকে সিদ্ধান্তের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

কিন্তু আমাদের আধুনিকপন্থীদের কর্মপন্থা এর বিপরীত। তাঁরা সিদ্ধান্তকে দলিলের অসুসারী না-বানিয়ে দলিলকে সিদ্ধান্তের অনুসারী বনানোর প্রবক্তা। এটা কেবল তাদের কর্মপন্থাই নয় বরং তাঁরা এই প্রক্রিয়ার গবেষণাকে সঠিক মনে করেন এবং এর প্রচারও করেন। তাঁরা তাঁদের লেখা ও বক্তৃতায় একথা বলে থাকেন যে, "আমরা কুরআন ও সুন্নাহ -এর এমন ব্যাখ্যা করতে চাই, যা আমাদের বর্তমান যুগের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম।"

এই বাক্যের সোজা-সাপটা অর্থতো এই যে, বর্তমান যুগে কুরআন ও সুন্নাহের আসল বিধান কী সেটা আমরা অনুসন্ধান করব না। বরং প্রথমে নিজের থেকেই নির্ধারণ করব যুগের প্রয়োজনটা কী। তারপর কুরআন ও সুন্নাহের মাঝে দলিল অনুসন্ধান করব। যদি পাওয়া না যায় তাহলে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যা (interpretation) করব যা আমাদের নির্ধারিত প্রয়োজন মুতাবেক হয়।

স্পষ্টতই লক্ষ্যণীয়, তাদের এই বাক্যে পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে যে, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তকে কুরআন ও সুন্নাহের দলিলের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ না করে কুরআন ও সুন্নাহকে নিজেদের সিদ্ধান্তের সাথে মিলাতে চাই। কুরআন ও সুন্নাহের দলিলের ভিত্তিতে কোন মূলনীতি দাঁড় করানো আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমাদের উদ্দেশ্য, যুগ চাহিদার আলোকে আমরা যে মূলনীতি স্থির করেছি, তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল অনুসন্ধান করা এবং তাকে টেনে-হেঁচড়ে আমাদের মূলনীতির সাথে ফিট করার চেষ্টা করা।

একেই বলা হয় 'তাহরীফে মানবী' বা ভাবের বিকৃতি। পৃথিবীর কোন যুক্তিবাদী মানুষই আধুনিক পন্থীদের এই চিন্তা-ধারা এবং যুক্তিকে সমর্থন করতে পারে না। কারণ গবেষণা ও পর্যালোচনার জগতে এই উল্টো প্রবাহ শুরু হয়ে গেলে সত্য ও ন্যায়ের ইজ্জত বাঁচানোর আর কোন পথ অবশিষ্ট

থাকে না। দুর্বল থেকে দুর্বলতর দাবীও যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা পুষ্ট করা যায়। দুনিয়ার কোন বিষয়ই দলিল বিহীন থাকে না। ইংরেজি প্রবাদ অনুসারে "প্রত্যেক বস্তুকে প্রত্যেক বস্তু দ্বারা প্রমাণ করা যায়।"

কারণ যখন আপনি একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন যে, কোন একটি বিষয় আপনাকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আপনি কুরআন ও সুন্নাহের 'আধুনিক ব্যাখ্যা' করার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলবেন। তাহলে এর সোজা অর্থ দাঁড়ায়, তার সমর্থনে দুর্বল থেকে দুর্বলতর কোন কথাও যদি আপনার দৃষ্টি গোচর হয় তাকেই আপনি দলিল হিসেবে পেশ করবেন। এর বিপরীতে মজবুত থেকে মজবুততর দলিল আপনার সামনে আসলেও তাকে প্রত্যাখ্যান করতে আপনার একটুও দ্বিধা হবে না। এ অবস্থানে পৌঁছলে কোন্‌টাই বা আর বাকী থাকবে যাকে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণ করা যাবে না?

আপনারা হয়ত জানেন, খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ মুসলিম বিশ্বের সরলপ্রাণ মুসলমানদের সামনে সর্বদা কুরআন ও হাদীস থেকেই তাদের আকাঈদ প্রমাণ করে। তারা বলে, দেখ কুরআন শরীফেও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে। যার অর্থ, তিনি আল্লাহর ছিফাত কালাম ছিলেন। ইঞ্জিল ইউহান্নাও এই কথাই বলে। কুরআনেও তাঁকে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার বুঝা যায়, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর রূহ। এবং আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্ক – যেমন শরীর এবং আত্মার সম্পর্ক। পোলসও তাই বলত। কুরআন এটাও বলে যে, 'আমি রূহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাঈলের মাধ্যমে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শক্তি দান করেছিলাম।' এর দ্বারা ইঞ্জিল মতি -এর মাঝে বর্ণিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে 'রূহুল কুদুস হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর কবুতরের আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন'।

লক্ষ্য করুন, খোদা, কালাম এবং রূহুল কুদুস তিন মৌলিক সত্ত্বার কথাই কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল। কুরআন যে-ত্রিত্ববাদের প্রকাশ্য বিরোধী এই 'আধুনিক ব্যাখ্যা'র দ্বারা সেই ত্রিত্ববাদই কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল। অবশিষ্ট থাকল কুরআনের ঐ সকল আয়াত যার ভিতর সরাসরি

ত্রিত্ববাদকে অস্বীকার করা হয়েছে। যেহেতু ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করা আগে থেকেই স্থির করে নেওয়া হয়েছে, সুতরাং সেগুলোর ব্যাখ্যায়ও বলা যেতে পারে ঐ সকল আয়াতে হাকিকী ত্রিত্ববাদকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর এটা খৃষ্টানগণও স্বীকার করে যে, খোদা তিন জন নয়, বরং এই তিন মৌলিক সত্তা প্রকৃত পক্ষে একজন। 'যারা মসীহ ইবনে মারয়ামকে আল্লাহ বলে তারা কাফের' কুরআনের এই উক্তি মূলতঃ মনোফিসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যায়। যে স্থানে কুরআন কারীম নাসারাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করেছে, সেখানেও ক্যাথোলিক সম্প্রদায় উদ্দেশ্য নয়। বরং মনোফিসী সম্প্রদায়ই তার উদ্দেশ্য। বাকী থাকে কুরআনের ঘোষণা – হযরত মসীহ আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানো হয়নি। তো এবারেও সাধারণ খৃষ্টানদের বিশ্বাস যে, মসীহের আত্মার ফাঁসী হয়নি। শুধু পেট্রিপেশিন সম্প্রদায় মসীহের আত্মার শূলে চড়ানোর প্রবক্তা। কুরআন তাদের দাবীই খন্ডন করেছে। কুরআন মসীহের শরীরের ফাঁসিতে চড়ার বিষয়টি খন্ডন করেনি।

লক্ষ্য করেছেন 'আধুনিক ব্যাখ্যার' কী কারিশমা ? কিভাবে যাবতীয় খৃষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাসকে কুরআনে কারীম দ্বারা প্রমাণ করে দেওয়া হল ? প্রশ্ন হল, আপনাদের 'আধুনিক ব্যাখ্যা' এবং খৃষ্টানদের 'আধুনিক ব্যাখ্যার' মাঝে পার্থক্য কী ? কুরআন ও সুন্নাহের 'আধুনিক ব্যাখ্যা' করে যদি ইসলামের সর্ব সম্মত বিধানকে পরিবর্তন করার অধিকার আপনাদের থাকতে পারে, তাহলে খৃষ্টানদের কেন থাকবে না ? কোন্ মূলনীতি এবং আইনের আওতায় তাদের এই 'আধুনিক ব্যাখ্যা'কে প্রত্যাখ্যান করবেন ?

কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, আমরা আধুনিকপন্থীদের 'আধুনিক ব্যাখ্যা'কে খৃষ্টানদের 'আধুনিক ব্যাখ্যার' সাথে তুলনা করে কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছি। কিন্তু আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমরা এখানে বিন্দু মাত্র অতিরঞ্জন করিনি। আমাদের আধুনিকপন্থী ভাইদের অধিকাংশ দলিল ঠিক এ ধরনেরই হয়। বিশ্বাস না হলে আপনারা তাদের লেখা পড়ে দেখুন। এই ধরনের 'আধুনিক ব্যাখ্যার' অসংখ্য প্রমাণ নজরে পড়বে।

ইসলামী গবেষণা সংস্থার ডাইরেক্টর ডক্টর ফজলুর রহমান সাহেব সম্প্রতি 'ইসলাম' নামের একটি বই লিখেছেন। তার মধ্যে অত্যন্ত চটকদার কিছু 'আধুনিক ব্যাখ্যা' বিদ্যমান। তাঁর মতে ইসলামে মৌলিকভাবে তিন ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। দুটি নতুন নামায রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের শেষ বৎসর যুক্ত হয়েছে। তাই নামাযের সংখ্যা পরিবর্তন করা যেতে পারে। তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেন ঃ

"সুতরাং মৌলিকভাবে নামায যে তিনটি ছিল তার প্রমাণ ঃ এক বর্ণনায় আছে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কারণ ছাড়াই চার নামাযকে দুই নামাযে একত্রিত করেছিলেন।' কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরবর্তি যুগে কোন বিকল্প সংখ্যা ছাড়াই বাধ্যতামূলকভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এবং নামায পাঁচ ওয়াক্ত হওয়ার সমর্থনকারী হাদীসের সয়লাবে মৌলিকভাবে তিন ওয়াক্ত নামাযের বিষয়টি ঢাকা পড়ে যায়।" (মাসিক নজর ও ফিকর পৃ. ২৫৯, সংখ্যা: ৫, অক্টো. ৬৭ইং)

দেখুন, কী চমৎকার এই 'আধুনিক ব্যাখ্যা'। এই আধুনিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী এক দিকে এমন অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদীস মিথ্যা ও মনগড়া প্রমাণিত হচ্ছে, যেগুলোর মধ্যে-ইসলামের শুরু যুগ থেকেই নামায পাঁচ ওয়াক্ত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে 'দুই নামায একত্রীকরণের' ঘটনা সম্বলিত একটি মাত্র বর্ণনা নির্দ্ধিধায় নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। তারপর 'জমা বাইনাস্ সালাতাইন, বা দুই নামাযকে একত্রে আদায় করার রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার নামাযকে দুই নামাযে পরিণত করেছিলেন। এটা তো ঐ 'ব্যাখ্যার' সবচেয়ে আকর্ষণীয় কৃতিত্ব। 'দুই নামায একত্রীকরণ' এর রেওয়ায়েতটি আপনারা পড়ে থাকলে তার স্বাদ অনুভব করতে পারবেন।১ এ ধরণের দলিল দেখে কেউ বলেছিলেন, 'তোমরা যে কোন বস্তুকেই যে কোন বস্তু থেকে প্রমাণ

(১) মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় জোহর এবং আসরের নামায খুব কাছাকাছি সময়ে এভাবে আদায় করতেন যে, যোহরের ওয়াক্তের একবারে শেষ সময়ে জোহরের নামায পড়ে নিতেন। তারপরই আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া মাত্র আসরের নামায পড়তেন। একে বলা হয় 'জমা বাইনাস্ সালাতাইন'।

করতে পার।"

এই একটা উদাহরণই আমরা আপনাদের সামনে পেশ করলাম। আসলে তো এই 'ব্যাখ্যার' যুগের নগ্ন থাবা থেকে কোন বিষয়ই রেহাই পায়নি।

আধুনিকপন্থীদের তাফসীর বের করে দেখুন। 'ব্যাখ্যার' কী বিরাট বিরাট কীর্তি দেখতে পাবেন তার মাঝে। তাদের নিকট 'ওহী' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজের কথা। ফিরিশতা দ্বারা বুঝানো হয়েছে পানি, বিজলী ইত্যাদি। ইবলিস অর্থ কল্পনা শক্তি, যার দ্বারা উদ্দেশ্য অসভ্য জাতি। 'ইন্‌স' অর্থ সুসভ্য মানুষ। 'মৃত্যু'র অর্থ সংজ্ঞাহীন, অপমান বা কুফর। 'জীবন' অর্থ সম্মান পাওয়া, হুঁস হওয়া বা ইসলাম গ্রহণ করা। পাথরের উপর লাঠি মারার অর্থ লাঠির সাহায্যে পাহাড়ের উপর আরোহন করা।

এই বিরল সূক্ষ্ম তাফসীর মাথায় রেখে একটু চিন্তা করে দেখুন, আমরা তাদেরকে খৃষ্টানদের সাথে তুলনা করে কি বাড়াবাড়ি করেছি?

যাক এটা ছিল একটি অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা। বলছিলাম, দলিলকে মূলনীতির অনুসারী বানানোর চিন্তা-ধারা গ্রহণ করা হলে খৃষ্টধর্ম, ইহুদী ধর্ম, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ সবই প্রমাণ করা যাবে কুরআন থেকে। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করেই পারভেজ সাহেব তার 'ইবলিস ও আদম' নামক গ্রন্থে ডারউইনের 'ক্রম বিবর্তন' মতবাদ কুরআন থেকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এবং কুরআনের وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (নামায প্রতিষ্ঠা কর) বাক্য থেকে তার উর্বর মস্তিষ্ক সমাজতান্ত্রিক স্টাইলের এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছে। এই প্রক্রিয়ার চিন্তা-ধারায় ভর করে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী 'দামেস্ক' দ্বারা কাদিয়ান অর্থ করেছে। হাদীসে ঈসা আলাইহিস সালাম 'বারে লুদ' নামক স্থানে দাজ্জালকে হত্যা করবেন বলে যে বর্ণনা রয়েছে, মির্জা সাহেব এর দ্বারা তার মসীহ মাওউদ হওয়ার দলিল দিয়ে বলেন, লুদ দ্বারা লুধিয়ানা বুঝানো হয়েছে এবং তার দরজা কাদিয়ান।

মোট কথা আধুনিকপন্থীরা গবেষণা ও দলিল উপস্থাপনের এই যে নতুন পন্থা এখতিয়ার করেছেন যে, প্রথমে নিজের থেকে মতাদর্শ নির্ধারণ করে তাকে যুগ চাহিদা বলে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়; তারপর ব্যাখ্যার নামে কুরআন ও সুন্নাহকে তার মত করে প্রমাণ করে দেখানো; এটাই প্রথম ফাউন্ডেশন যার

বক্রতা তাদের চিন্তা ও দর্শনের ইমারতকে বাঁকা করে ফেলেছে। এটাই মৌলিক কারণ যে, তাদের গবেষণা ও দর্শন যাবতীয় মূলনীতি, নিয়ম-কানুন এবং ফর্মুলাকে পদদলিত করে 'বিকৃতির' পরিমন্ডলে ঢুকে পড়েছে।

পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় চিন্তা ভাবনা গবেষণা জন্য কিছু মূলনীতি নির্ধারিত থাকে। যার অনুসরণ ছাড়া সে বিষয়ের গবেষণায় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। বর্তমান আইনশাস্ত্রেও (Jurisprudence) উদ্ভাবিত আইনের ব্যাখ্যা (intepretation of statuies) একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। তার মূলনীতি ও নিয়মপদ্ধতি রয়েছে। সুতরাং এই মূলনীতি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ না-করা হলে কোন আইনজ্ঞের ব্যাখ্যাই গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না।

অনুরূপভাবে বরং তার চেয়ে অনেক বেশী যুক্তি গ্রাহ্য এবং সুবিন্যস্ত আকারে ফিকহ এবং কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যার বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। যেগুলো 'উসূলে ফিকহ' শাস্ত্রে ব্যাপক গবেষণা-পর্যালোচনা এবং সূক্ষ্ম চিন্তা ও আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে সংকলিত হয়েছে। এই বিষয়ের উপর শত শত গ্রন্থ বিদ্যমান এবং এর প্রত্যেকটি মূলনীতি বা কায়দা ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে লেখা হয়েছে। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যা এই মূলনীতি অনুযায়ী না হলে বিবেক সম্পন্ন কোন মানুষ তা গ্রহণ করতে পারে না। যেমনিভাবে 'উদ্ভাবিত আইনের ব্যাখ্যার' মূলনীতি অনুযায়ী না হলে কোন আইনজ্ঞের আইনী ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হয় না।

কিন্তু আমাদের আধুনিকপন্থীরা ভুল চিন্তা-ধারাকে গ্রহণ করার কারণে তাঁদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এই মূলনীতির কোনটাই তাঁরা অনুসরণ করেন না। ফলে প্রায়ই কুরআন-সুন্নাহ-ব্যাখ্যার সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতির বিরোধিতা করে বসেন। যেমন উসূলে ফিক্হর একটি সর্বসম্মত মূলনীতি হল, কুরআন ও হাদীসের কোন শব্দের হাকিকী (মূল) অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হলে, কিংবা লোক সমাজে অর্থটা বর্জিত হলে কেবল তখনই মাজাযী (রূপক) অর্থ গ্রহণ করা যাবে। অন্যথায় মূল অর্থই গ্রহণ করতে হবে। এটা একটা শতভাগ যুক্তিগ্রাহ্য মূলনীতি, যা আকলের দাবীদার কোন লোকই চ্যালেঞ্জ করতে

পারে না। এই মূলনীতি গ্রহণ না-করলে কোন ব্যক্তির কোন কথা থেকে নির্দিষ্ট কোন অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

কিন্তু আমাদের আধুনিকপন্থীরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই মূলনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেন। কুরআন ও হাদীসের কোন শব্দ তাদের পছন্দের খেলাফ হলেই সাথে সাথে নিজেদের পছন্দসই রূপক অর্থ বসিয়ে দেন। 'পুত্রের' অর্থ করেছেন 'পৌত্র'; লাঠির অর্থ করেছেন 'দলিল'। 'মৃত্যু' থেকে 'অচেতন' বা 'অপমান' এবং 'ইবলিস' থেকে 'কাল্পনিক শক্তি' অর্থ করা হয়েছে। এমনকি আল্লাহ এবং রাসূল দ্বারা 'জাতির কেন্দ্র' অর্থ করা হয়েছে।১

ফিকহশাস্ত্রবিদগণ 'উসূলে ফিক্‌হ' এর মাঝে যেসব যুক্তিগ্রাহ্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলো না হয় গ্রহণ না-ই করলেন। কিন্তু আপনারা কানুন ব্যাখ্যা কালে অন্য কোন মূলনীতি তো অনুসরণ করবেন। 'উসূলে ফিকহ' এর মূলনীতি যদি আপনাদের মনপুত না হয় তাহলে দলিল দিয়ে প্রমাণ তো করবেন, কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যার এই মূলনীতিগুলো ভুল। তারপর দলিলসহ তার বিকল্প কোন মূলনীতি নির্ধারণ করতঃ আপনাদের গবেষণার ক্ষেত্রে এই সব মূলনীতি অনুসরণ করতেন।

কিন্তু আমরা দেখছি, আপনাদের ব্যাখ্যার জন্য কোন মূলনীতি, নিয়ম-পদ্ধতি বা কায়দা-কানুনই নেই। একস্থানে এক মূলনীতিকে ভেঙ্গে দিয়েছেন এবং সাথে-সাথে তার বিরোধিতাও করেছেন। অথচ অন্যত্র যেখানে সেই মূলনীতিটিই আপনার মতের স্বপক্ষে মনে হয়, সেখানে নির্দ্বিধায় সেটা গ্রহণ করছেন। আপনাদের নির্ধারিত মতাদর্শের পরিপন্থী কোন হাদীস নজরে পড়লে সেটা আপনারা প্রত্যাখ্যন করেছেন। সনদের দিক থেকে হাদীসটি যত সুদৃঢ়ই হোক না কেন আবার কোন হাদীস নিজেদের মতাদর্শের সমর্থন করলে তার উপর ভিত্তি করে কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট আয়াতও ছেড়ে দিচ্ছেন। এ হাদীসটি সনদের বিবেচনায় যত দুর্বল এবং অনির্ভরযোগ্যই হোক

১. বিভিন্ন আধুনিকপন্থী লেখকই কুরআনের শব্দের এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। তবে একত্রে পাওয়ার জন্য পারভেজ সাহেবের মা'আরিফুল কুরআন দেখুন।

না কেন। পূর্ব যুগের উলামায়ে কিরামের মতামত যদি আপনাদের মতের খেলাপ হয়, তাহলে আপনারা সমস্ত উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকেও পিছনে ঠেলে দেন। আর কোন এক আলেম বা ফিক্হবিদের কথা নিজেদের মতানুযায়ী হলে নির্দ্বিধায় সেটা গ্রহণ করে নেন। কথাটি দুর্বল হলেও তাতে কোন পরোয়া করেন না।

এর, তাজা উদাহরণ ডক্টর ফজলুর রহমানের বক্তৃতা। যার মধ্যে তিনি বিসমিল্লাহ ছাড়াই জবাইকৃত পশুকে হালাল ফাতওয়া দিয়েছেন। কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

(যার [জবাইকৃত পশুর] উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় নি সেটা খেও না।)

এটা যেহেতু ড. ফজলুর রহমান সাহেবের মতাদর্শের পরিপন্থী ছিল, তাই এক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর এক বর্ণনা থেকে এবং হযরত ইমাম শাফী (রহঃ) এর সমস্ত ফিকহী মতামতের মধ্যে বোধ হয় সর্বাধিক দুর্বল একটি অভিমত থেকে দলিল দিয়েছেন। (এই দুর্বলতার কথা শাফী আলেমগণও স্বীকার করেছেন।)

অথচ তিনি হাদীসের রেওয়ায়েতের ব্যাপারে নিজের মত সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"যদি কোন হাদীস কুরআনের প্রকাশ্য শিক্ষার পরিপন্থী কথা বলে, তাহলে আমি সেই হাদীসকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে সম্পৃক্ত না করে ইসলামী ইতিহাসের এক বিশেষ যুগের দিকে সম্পৃক্ত করব।" (মাসিক নজর ও ফিকির, বর্ষ : ২, সংখ্যা : ৮, পৃ. ৫১৫)

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর হাদীস থেকে বিসমিল্লাহ ব্যতীত জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার যে দলিল পেশ করেছেন সেটা যত ভুলই হোক, না-হয় মেনে নিলাম। কিন্তু আপনি আপনার মত নির্ধারণ করেছিলেন, যে হাদীস কুরআনের সাথে না মিলবে আমি তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এর দিকে সম্পৃক্ত করব না। তাহলে কি করে আপনি সেই হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা বিশ্বাস করলেন যেটা কুরআনের প্রকাশ্য শিক্ষার বিরোধী ?

এদিকে ইমাম শাফী (রহঃ) সম্পর্কে আপনার বক্তব্য ছিল ঃ

"ইমাম শাফী (রহঃ) এর তীক্ষ্ণ মেধা ও স্বভাবগত বুদ্ধি এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এর দ্বারা আমাদের মধ্যযুগীয় সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোতে দৃঢ়তা এসেছে। কিন্তু পরবর্তিতে তাঁর কারণে আধুনিক চিন্তা চেতনা ও সৃজনশীলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে।"

(মাসিক নজর ও ফিকির, বর্ষ ও সংখ্যা : ১ পৃ : ৩০)

এখানে প্রশ্ন হল, যে ইমাম শাফী (রহঃ) এত বড় মারাত্মক 'উসূলী ভুল' করতে পারেন, কোন মাসআলায় তার মতামত দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা আপনার জন্য কি বৈধ হবে ?

অতএব এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে, তাঁদের মস্তিস্কে গবেষণা ও দলিল নির্ধারণের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট মূলনীতি নেই? তাঁরা তাদের 'আধুনিক ব্যাখ্যার' ক্ষেত্রে উসূলে ফিক্হ এর কোন মূলনীতিকে অনুসরণ করেননি শুধু তাই নয়; বরং নিজেদের উদ্ভাবিত মূলনীতিরও ধার ধারেন নি তাঁরা।

ভেবে দেখুন, তাদের মূলনীতি থেকে পালায়ন নীতির এটাই কারণ যে, তাঁরা প্রথমে মতাদর্শ কায়েম করেন। তারপর দলিল অনুসন্ধান করেন। এই কর্মপন্থা উসূল ও মূলনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতেই পারে না। তাই তাদেরকে প্রত্যেক মতের জন্য পৃথক মূলনীতি নির্ধারণ করতে হয়।

এখন যদি কোন ব্যক্তি তাদের নিকট আবেদন করেন, মেহেরবানী করে আপনারা 'ইলম ও গবেষণার' উপর রহম করুন, এবং ইহুদী ও খৃষ্টানরা যেভাবে তাওরাত ও ইঞ্জিলকে খেলনার সামগ্রী বানিয়েছিল অনুরূপভাবে কুরআন-সুন্নাহকে আপনারা খেলার সামগ্রী বানাবেন না; তাহলে সেই ব্যক্তি তাদের নিকট সেকেলে, গোড়া এবং 'যুগ চাহিদার বিরোধী' বলে সাব্যস্ত হয়। তার সম্পর্কে আধুনিকপন্থীদের ফাতওয়া হল ঃ

'তারা আধুনিক যুগকে অস্বীকার করে এবং তার চাহিদা সম্পর্কে অজ্ঞ।'

(মাসিক নজর ও ফিকির, বর্ষ : ২, সংখ্যা : ১২, পৃ : ৭৩১)

আমরা জানি, আমাদের আবেদনের জবাবেও এই একটি অভিযোগ আসবে। তথাপি আমরা এই আশায় আবেদন জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও ইন্‌শাআল্লাহ্ জানাব যে, হয়ত আমাদের কথাগুলো কোন ব্যথিত হৃদয়ে আঘাত করবে। হয়ত কারো বোধোদয় হবে যে, গবেষণার নাম করে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে?

উলামা ও পোপতন্ত্র

কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা এবং প্রতিনিয়ত উদ্ভূত নতুন-নতুন মাসআলার ব্যাপারে বিধান উদ্ভাবনের দায়িত্ব কার ? তার জন্য কী কী শর্ত এবং কী কী যোগ্যতার (qualifications) প্রয়োজন ? এই প্রশ্নের উত্তর হযরত আলী (রাযিঃ) এর বর্ণিত এক সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়। তিনি ইরশাদ করেন ঃ

قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأ مرني؟ قال تشاوروا الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه راي خاصة رواه الطبراني في الأ وسط ورجاله موتقون من اهل الصحيح (مجمع الزوائد ص ٧١ج ١المطبع الأ نصاري دهلي ٥١٣٠٨)

"আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের সামনে যদি এমন কোন মাসআলা উপস্থিত হয় যার বিবরণ (কুরআন ও হাদীসে) নেই – কোন আদেশ ও না, কোন নিষেধাজ্ঞাও না। এমন অবস্থায় আপনার পক্ষ হতে আমার জন্য কি নির্দেশ ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ফকীহ এবং আবিদগণের সাথে পরামর্শ কর। এবং এ ব্যাপারে কারো ব্যক্তিগত রায় কার্যকর করো না।"

এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, কুরআন সুন্নাহ থেকে বিধান উদ্ভাবন করার জন্য ব্যক্তির মাঝে দুটি গুণ থাকা অত্যন্ত জরুরী। এক 'ফকীহ' হওয়া, দুই 'আবিদ' হওয়া। প্রথমে শর্তের গুরুত্ব একবারে সুস্পষ্ট। কারণ কুরআন-সুন্নাহ -এর সঠিক অর্থ তিনিই বুঝবেন যিনি কুরআন-সুন্নাহের ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান রাখেন। আহকামের ব্যাপারে বর্ণিত মূলনীতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। এবং যিনি এই কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দ্বীনে ইসলামের মেজায

বুঝার প্রাণান্ত চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। অনুরূপভাবে 'আবিদ হওয়া' অর্থাৎ ইসলামী বিধি-বিধানের পুরোপুরি অনুসারী হওয়াকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জরুরী ঘোষণা করেছেন। কারণ, যিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনে হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয এর পার্থক্য করেন না, রাত দিন যার ইসলামী আহকামের বিরোধিতায় অতিবাহিত হয়; দ্বীনের মেজাযকে তিনি কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারেন না। বিধান উদ্ভাবন মূলতঃ সত্যানুসন্ধানের অপর নাম। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহপাক সত্য বুঝার যোগ্যতা তাকেই দান করেন, যিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে সত্যকে আমলে বাস্তবায়িত করেন।

إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا

যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে (হক ও বাতিলের) পার্থক্য-শক্তি দান করবেন।

আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার অপরিহার্য শর্ত হল 'তাকওয়া'। তা ছাড়া এই অসাধারণ যোগ্যতা লাভ করা যায় না।

সুতরাং কুরআনের এই আয়াত এবং উল্লিখিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, ইসলামী সমাজে যেসব নতুন মাসআলা উদ্ভূত হতে পারে তার ধর্মীয় ও ফিক্হী সমাধান কেবল তারাই দিতে পারবেন, যারা একদিকে ফকীহ্ অন্যদিকে আবিদ বা মুত্তাকী।

হযরত মাওলানা মুফতী শফী ছাহেব (রহঃ) তাঁর এক বক্তৃতায় একথাই সংক্ষিপ্তভাবে বলেছিলেন যে, কুরআন ও সুন্নায় যেসব মাসআলার বিধান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই সেগুলোর সমাধানের পন্থা হল, মুত্তাকী মুফতী ও উলামায়ে কিরামের পরস্পর পরামার্শ। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া অন্যায়।

কিন্তু কেন যেন আমাদের আধুনিকপন্থীদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত অপছন্দ। তারা কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার থেকে বিধান উদ্ভাবনের জন্য আলেম ফকীহ, মুফতী কোনটাই জরুরী মনে করেন না।

মুত্তাকী, পরহেজগার হওয়াও আবশ্যক মনে করেন না। তাদের পক্ষ হতে আওয়াজ উচ্চারিত হচ্ছে :

"কুরআন-সুন্নাহের ব্যাখ্যার জন্য আলেমগণকে ঠিকাদারী দেওয়া হয়নি – পোপতন্ত্রের স্থান নেই ইসলামে। তাই বিধান উদ্ভাবনের অধিকার বিশেষ কোন গোষ্ঠীকে প্রদান করা যায় না – কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যার অধিকার সকল মুসলমানের রয়েছে, কেবল উলামায়ে কিরামের নয়। আলেমদেরকে ইসলামের ব্যাপারে কোন ভেটো পাওয়ার দেওয়া যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।" এই শ্লোগান আধুনিকপন্থীদের মুখ থেকে অহরহই শোনা যায়।

এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা আমরা উল্লেখ করেছি যে, সেই ঘোষণায় দ্বীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য ইল্‌ম ও তাকওয়ার শর্তকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই শ্লোগানের অভ্যন্তরে লুকায়িত ভুল ধারণাটির তত্ত্ব উদঘাটন করে দেওয়াও প্রয়োজন, যার গান আমাদের আধুনিকপন্থীরা সকাল-সন্ধ্যা গাইতে থাকেন।

"তাদের প্রথম শ্লোগান, ইসলামে পৌরহিত্য বা পোপতন্ত্র নেই। তাই আলেমদের বিশেষ শ্রেণীকে বিধান উদ্ভাবনের অধিকার দেয়া যাবে না।"

এই ধরনের কথা যারা বলেন তারা হয় জাজকতন্ত্র ও থিওক্রেসী অর্থ এবং তার মূল খারাবি সম্পর্কে অজ্ঞ। অথবা জেনে শুনে তারা সরল-প্রাণ মানুষকে ধোঁকা দিতে চান। যার অন্তরে ইনসাফ ও সত্যানুসন্ধানের সামান্যতম বিবেচনাবোধও আছে সে খুব সহজে অনুভব করতে পারবে যে, 'ইল্‌ম' ও 'ফিক্‌হ' এবং 'তাকওয়া' এমন কোন খানদান বা ব্যক্তিসত্তার নাম নয়, যা ইচ্ছে করলে মানুষ নিজে অর্জন করতে পারবে না। বরং এ হলো কোন বিশেষ কাজের যোগ্যতার (eligibility qualifications) নাম। প্রত্যেক ব্যক্তিই যে কোন সময়ে তা অর্জন করতে পারে। কোন কাজের জন্য কোন যোগ্যতা নির্ধারণ করা যদি আপনাদের কাছে পোপতন্ত্র হয়, তাহলে জীবনের কোন্ ক্ষেত্রটা এই পোপতন্ত্র থেকে মুক্ত ? রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং মন্ত্রীত্বের জন্য যে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং নৈতিক মানদন্ড নির্ধারণ করা হয় সেগুলোও তাহলে আপনাদের বিবেচনায় পোপতন্ত্র হবে। বিচারকের জন্য আইন শাস্ত্রে পারদর্শিতার যে শর্তারোপ করা হয় তাকেও পোপতন্ত্র বলতে হবে।

উকালতির জন্য নূন্যতম এল,এল,বি, পাশের যে প্রয়োজন মনে করা হয় তাকেও বলুন পোপগিরি। ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতার জন্য যে সব ডিগ্রি অত্যাবশ্যক বলে নির্ধারণ করা হয়েছে সে ব্যাপারেও ফতোয়া দিন – এর উপরও পোপতন্ত্রের আত্মা সওয়ার হয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বয়স, বিবেক ও নৈতিক চরিত্রের যে শর্তারোপ করা হয়, সেখানেও এই অভিযোগ করুন এদের উপর পোপগিরির কালো ছায়া পড়েছে।

এ সকল কাজের জন্য যোগ্যতার শর্তারোপ করা পোপগিরি না হলে কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইল্‌ম ও তাকওয়ার শর্ত লাগানো কোন্ যুক্তিতে পোপতন্ত্র হবে ?

যিনি পৌরোহিত্য এবং পোপতন্ত্র সম্পর্কে সামান্য পড়াশুনাও করেছেন, তিনি উলামা এবং পোপ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিম্নে লিখিত মোটা-মোটা কয়েকটি পার্থক্য খুব সহজেই বুঝতে পারবেন।

১. ব্রাহ্মণ এবং পোপ কার্যত এ দুটো বর্ণ ও বংশ এবং জাতভেদ প্রথা উদ্ভাত বিশেষ শ্রেণীর নাম। বাইরের কোন ব্যক্তি হাজারো প্রচেষ্টা এবং সাধারণ যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। এ কারণে, পোপ জগতে ডাকাত ও সন্ত্রাসীকে পোপ বানিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। পক্ষান্তরে আলেম এমন একটি যোগ্যতার নাম, যা অর্জন করতে কোন গোত্র বা বর্ণের শর্ত নেই। চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রত্যেক গোত্র ও বংশ থেকেই আলেম হয়েছে। এমনকি দাস-দাসীদের মধ্যে অনেক বড়-বড় আলেম সৃষ্টি হয়েছেন এবং দেশ ও জাতির নেতৃত্বও দিয়েছেন। তাদের মর্যাদার কারণ, তাদের ইল্‌ম ও তাকওয়া; কোন বিশেষ বংশ নয়।

২. পোপগণ যে ধর্মের ব্যাখ্যাতার দাবীদার সে ধর্মের শিক্ষা; জীবনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চুপ। এ কারণে তথায় পোপগণের ইচ্ছা খোদার ইচ্ছার রূপ নিয়েছে। অন্য কেউ এর উপর কোন অভিযোগ তুলতে পারে না। তাই তারা আইন-কানুনের ব্যাখাকারী নয় বরং এক স্বাধীন আইন প্রণেতা। এর বিপরীতে কুরআন ও সুন্নাহের বিধান সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত এবং এর মূলনীতিসমূহ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত। কোন আলেম এই মূলনীতির বিপরীত

কিছু বললে অন্য আলেমগণ তার ভুল শুধরানোর জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত রয়েছে এবং থাকে।

৩. পোপতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কানুন তৈরি এবং ধর্মীয় ব্যাখ্যার দায়িত্বভার সর্বশেষ পর্যায়ে ব্যক্তি বিশেষের উপর অর্পিত হয়। একমাত্র সেই ব্যক্তিকেই 'মসীহী ভেড়ার রাখাল' এবং গীর্জার অনুসারীদের প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে উলামা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয় যিনি কোন নির্দিষ্ট সংগঠনের নেতা। বরং যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ মূলনীতির আলোকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেছে সেই আলেম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওয়ারিশ। তাই কোন এক আলেমের ব্যক্তিগত অভিমত সকল উম্মতের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই।

পোপগণের বিধান তৈরি এবং উলামাগণের কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যার মধ্যে এতবড় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি বিবেক-বুদ্ধি, সততা-নিষ্ঠার মাথা খেয়ে আলেমগণের উপর পোপগিরির অপবাদ আরোপ করেন, তাহলে তার বিচারক আল্লাহই।

এই পোপগিরির বিষয়টি আধুনিকপন্থীদের পক্ষ হতে এভাবেও বলা হয়ে থাকে যে, "কুরআন ও সুন্নাহের উপর কারো ঠিকাদারিত্ব নেই। তাই এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকার কেবল আলেমদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।"

প্রপাগান্ডায় তারা এতই দক্ষ যে, লাগাতার এই শ্লোগান তারা দিয়েই চলছে। কিন্তু কোন আল্লাহর বান্দা এটুকু চিন্তা করার কষ্ট স্বীকার করছে না যে, এই অভিযোগের উদাহরণটি ঠিক এমন যে, কোন ব্যক্তি মেডিকেল কলেজের আকৃতি পর্যন্ত চোখে দেখিনি অথচ সে ব্যক্তি অভিযোগ করছে যে, দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারদের ঠিকাদারী দেয়া হল কেন ? মানুষ হিসেবে আমারও এই অধিকার থাকা উচিৎ। অথবা কোন নির্বোধ ব্যক্তি বলল, দেশে নদী, পুল, ইমারত, নির্মাণের একচেটিয়া ঠিকাদারী ইঞ্জিনিয়ারদেরকে কেন দেয়া হয়েছে ? আমিও এই কাজ বাস্তবায়িত করার অধিকার রাখি। বা কোন বিবেকহীন ব্যক্তি এই অভিযোগ উত্থাপন করল যে, দেশের আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ঠিকাদারী শুধু আইন

বিশেষজ্ঞদের হাতে কেন কুক্ষিগত করা হয়েছে ? প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান হিসেবে আমিও এ কাজ করতে পারি।

আমাদের বিশ্বাস হয় না যে, কোন সুস্থ বিবেকের মানুষ এমন ধরনের কথা বলতে পারে। বাস্তবিকই যদি কোন ব্যক্তি অন্তরে এই আক্ষেপ পোষণ করে তাহলে তাকে বলতে হবে যে, একজন নাগরিক হিসেবে নিশ্চয় এসব কাজের অধিকার তোমার আছে। কিন্তু এই কাজের যোগ্যতা অর্জনের জন্য বছরের পর বছর অধ্যবসয়ের সঙ্গে পড়া-শোনা করতে হয়। অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষকদের কাছ থেকে এই বিদ্যা শিখতে হয়। এর জন্য ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। আগে এই ত্যাগ স্বীকার কর, তারপর তুমি নির্দ্বিধায় এই কাজ করতে পারবে।

সুতরাং এই কথাটিই যদি কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজের ক্ষেত্রে বলা হয়, তাহলে ঠিকাদারী হবে কেন ? তাহলে কি কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই ? এর জন্যে কোন শিক্ষাঙ্গনে অধ্যয়ন করা এবং কোন শিক্ষক থেকে বিদ্যা অর্জন করার প্রয়োজন নেই ? পৃথিবীতে কুরআন সুন্নাহের বিদ্যাই কেবল এমন অসহায় হয়ে পড়ল যে, তার ব্যাপারে যে কোন ব্যক্তি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অধিকার রাখে ? অথচ কোরআন-সুন্নাহের ইল্‌ম অর্জনের জন্য সে এক মাস সময়ও ব্যয় করেনি।

আধুনিকপন্থী ভাইয়েরা আলেমগণের উপর সকাল-সন্ধ্যা তাদের ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করেন যে, তারা কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যার যোগ্য হলো কী করে ? কিন্তু তারা এতটুকু চিন্তা করে দেখলেন না যে, আলেমগণ এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য কতটা কষ্ট সহ্য করেছেন ? দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনামলে তাদের নির্যাতন-নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে, এবং যেহেতু ইংরেজদের পক্ষ হতে তাদের জীবিকা নির্বাহের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, এই কারণে ধন-সম্পদের আকর্ষণ উপেক্ষা করে, নিরামিশ খেয়ে, মোটা কাপড় পরে, তার উপর আপনাদের ভর্ৎসনা সয়ে কিভাবে এই বিদ্যা অর্জন করেছেন ? বছরের পর বছর কী করে বাতির সামনে চোখ ঝলসিয়েছেন! জীবন, সম্পদ এবং চাহিদার কত শত কুরবানী দিয়ে ইল্‌মে

দ্বীনকে জীবিত রেখেছেন ! কিভাবে নিজের জীবনকে দ্বীনের আহকামের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন ! এত কিছুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করার অধিকার প্রদান করেন এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ তাদের এই অধিকারের উপর আস্থা রাখে তাহলে আপনাদের এর উপর আপত্তি কেন ?

কুরআন ও হাদীস ব্যাখ্যার এই যে উৎসাহ-উদ্দীপনা – অবশ্যই এটা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এর জন্য প্রথমে যে কিছু সাধনার প্রয়োজন, তার স্বাদতো আগে চাখবেন। জীবনের কিছু অংশ কুরআন-হাদীসের ইলমের ময়দানে অতিবাহিত করুন। সেই ময়দানের শিষ্টাচার শিখুন। এরপর কোন ব্যক্তি আপনার কুরআন-সুন্নাহের ব্যাখ্যার যোগ্যতা স্বীকার না করলে আপনার অভিযোগ নিঃসন্দেহে বৈধ এবং সত্য।

ড. ফজলুর রহমান সহেবের পক্ষ হতে মাসিক 'নজর ও ফিকির' এ বলা হয়েছিল : "ইসলামে সামগ্রিকভাবে উম্মতই(?) বিধান তৈরির কাজ করে আসছে। আজও তাদের এই অধিকার থাকা উচিৎ।'

কিন্তু যদি তিনি এর ব্যাখ্যা করে দিতেন যে, সামগ্রিকভাবে উম্মতের বিধান তৈরির অর্থ কি লক্ষ-কোটি উম্মতের সকল ব্যক্তির প্রত্যেকেই বিধান তৈরির কাজ করবে এবং মুর্খ-অশিক্ষিত ব্যক্তিও এই কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে ? না কি উম্মতের এই অধিকার লাভের অর্থ এই যে, তারা নিজেদের মধ্য থেকে এমন কিছু যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার রাখে, যারা কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যার উপযুক্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরকেতো সেই নির্বাচিত ব্যক্তিদের কাজের উপরই নির্ভর করতে হবে। জনগণের প্রত্যেকেই রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিকার ফলাও করতে পারবে – গণতান্ত্রিক অধিকারের এই অসার অর্থ কট্টর গণতন্ত্রীরাও করেন না। বরং তাদের মতেও প্রতিটি বিষয় তার নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের হাতে অর্পণ করা হয়। আর যারা এই বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা বিশেষজ্ঞদের কথার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করে। এটাকে কেউ বলে না যে, জনগণের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

জনগণের অধিকারের এই ব্যাখ্যা পর এখন আপনিই বলুন, এই দেশের দশ কোটি মুসলমান কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কাদের উপর বিশ্বাস রাখে ? কুরআন-সুন্নাহের কোন বিধান বুঝার প্রয়োজন দেখা দিলে তারা তথাকথিত ইসলামী গবেষণা সংস্থা বা অন্য কোন প্রগতিশীল (?) সংগঠনের কাছে যাবে – না ঐ সব 'রক্ষণশীল' আলেমদের কাছে যাবে যারা আপনাদের ভাষায় জনগণের অধিকার হরণকারী ? মুসলমানগণ কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা জানার জন্যে কোন আইনের চাপ বা জোর-জবরদস্তি ছাড়া স্বেচ্ছায় যদি আলেমগণের কাছেই যায়, তাদের উপরই আস্থা পোষন করে, তাদের কথায়ই তাদের অন্তর নিশ্চিন্ত হয় – বর্তমান মুসলিম সমাজের এই বাস্তব চিত্রকে কেইবা অস্বীকার করতে পারবে – তাহলে আপনারাই বিবেচনা করুন, জনগণের অধিকার কোন অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হয় ? আলেমদেরকে কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যার অধিকার দিলে ? না ঐ সব আধুনিকপন্থী ভাইদেরকে কুরআন-সুন্নাহর উপর অত্যাচারের খড়গ চালানোর প্রকাশ্য অনুমতি দিলে; যাদের বিকৃতির তরবারী জনগণের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে।

আবশেষে তাদের বড় অভিযোগ তাকওয়ার শর্তারোপের উপর। তাদের মতে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য ইল্‌ম এর মত তাকওয়ারও প্রয়োজন নেই। তাদের কাছে সবচেয়ে বড় আশংকার ব্যাপার হল ঃ

"মুত্তাকী হওয়া এমন একটি শর্ত যে, এর উপর ভিত্তি করে আলেমগণ নিজের ফতোয়ার পরিপন্থী অন্য কারো রায়কে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তার কারণ, তাকওয়া পরীক্ষা করার মাপকাঠি হয় স্ব-স্ব রুচি মাফিক।" (নজর ও ফিকির, নভেম্বর ৬৭ইং, পৃ: ৩২৬)

এ ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে, কিছু সময়ের জন্যে ব্যক্তিগত সন্দেহের হাত থেকে মুক্ত হয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে এ ব্যাপারে আর কোন আশঙ্কা থাকবে না। যে জনগণকে আপনারা বিধান প্রণয়ের অধিকার দিতে চাইছেন তারাই এই সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা রাখে যে, কোন ব্যক্তির মাঝে তাকওয়ার শর্তগুলো পুরোপুরিভাবে পাওয়া যায় ? সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ভুল হয় না কখনো। তাদের যবান 'আল্লাহর

বাণী'। যে ব্যক্তির 'তাকওয়ার' উপর অধিকাংশ মুসলমানের আস্থা থাকে তাকে কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যার দায়িত্ব দেওয়ায় কী অসুবিধা ?

ভাল করে জেনে রাখুন, 'তাকওয়া' অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যের নাম নয় যে, সকলেই তার নিজের রুচি ও স্বভাব অনুযায়ী এর সংজ্ঞা দিবে। ইসলামে 'তাকওয়া' একটি সাংবিধানিক মূলনীতি। শরীয়তের অসংখ্য বিধান এর উপর নির্ভরশীল। সাংবিধানিক অর্থে ব্যবহার করলে এর অর্থ হবে নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন, কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সগীরা গুনাহে বারবার লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা থেকে সংশোধিত হওয়া। কুরআনের পরিভাষা অনুসারে যেটা 'ফুজূর' এর বিপরীত। ঘোষণা হয়েছে ঃ

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

"তারপর তিনি তাকে তার অসৎকর্ম এবং সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।"

সুতরাং যে ব্যক্তি ফুজূর তথা প্রকাশ্য পাপকর্ম থেকে মুক্ত থাকবে, সেই এই সাংবিধানিক সম্বোধন অনুযায়ী মুত্তাকী। এই কারণে, কোন ব্যক্তির তাকওয়া পরীক্ষা করার জন্যে জনগণকে তেমন কোন সমস্যায় ভুগতে হয় না। এই কথাগুলো স্মরণ রেখে বলুনতো কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যার জন্য 'ইলম' ও 'তাকওয়ার' শর্তারোপে কী অসুবিধা হয়েছে ?

পরিশেষে আমরা আধুনিকপন্থী ভাইদের খেদমতে সবিনয়ে নিবেদন করব যে, ইলমী ও ফিকরী আলোচনায় প্রচলিত শ্লোগান ছেড়ে দিয়ে এবং নিছক প্রোপাগান্ডার হাতিয়ার ব্যবহার করে দেশ ও জাতির কোন কল্যাণও সাধন করা যায় না, কোন সমস্যারও সমাধান হয় না। এর দ্বারা কোন চিন্তাশীল বিবেকের উপর এই কর্মপন্থার কোন ভাল প্রভাবও পড়ে না। বেশীর চেয়ে বেশী এই শ্লোগানের বন্দীশালায় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হকের আওয়াজকে আটকে রাখা যায়। কিন্তু এর দ্বারা শুধু কর্ণই প্রতারিত হয়, অন্তর নয়। এক সময় শ্লোগানদাতাদের আওয়াজ বসে যায়। শুকিয়ে যায় তাদের কণ্ঠনালী। তখনি হকের গুরুগম্ভীর আওয়াজ পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত

হয়। প্রভাবিত করে সত্যানুসন্ধানীর অন্তরকে। আর চির দিনের জন্যে তা তার হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে যায়। আল্লাহর ঘোষণা ঃ

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَايَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

অতএব ফেনাতো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে।

বিজ্ঞান ও ইসলাম

চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান যে তথ্য দিয়েছে আল্-কুরআনের দৃষ্টিতে তা কি সঠিক ? কেউ বলেন, বিজ্ঞান ও কুরআন-হাদীসের মাঝে কোন বিরোধ নেই। অতএব বিজ্ঞানের সকল তথ্যই নির্ভুল। কেউ বলেন, বিজ্ঞানের মতাদর্শ কুরআনের পরিপন্থী। তাহলে কোনটি সঠিক ?

১. সর্ব প্রথম বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা এই সৌরজগতে যে সব শক্তি সৃষ্টি করে রেখেছেন তা উদঘাটন করাই বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। এই শক্তি যদি মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েযই নয় বরং উত্তম কাজ। ইসলাম তাদের প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পরিবর্তে আরো উৎসাহ যুগিয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামের দাবী শুধু এতটুকুই যে, এই শক্তিগুলোকে ঐ সব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে যা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ এবং কল্যাণকর। অন্য ভাষায় বলা যায়, বিজ্ঞানের কাজ শুধু সৌরজগতের সুপ্ত শক্তিগুলো আবিষ্কার করা। আর ধর্ম এই শক্তির সঠিক ব্যবহার ক্ষেত্র নির্দেশ করবে। নির্ধারণ করবে তার গবেষণা কর্মের জন্য সঠিক পন্থা এবং উত্তম ক্ষেত্র। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেবল তখনই মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে, যখন তাকে ইসলামে বর্ণিত মূলনীতি অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। অন্যথায় এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিজ্ঞান মানুষের জন্য বৈষয়িক উন্নতির যেমন কারণ হতে পারে; তেমনি ভুল ব্যবহারের কারণে আমাদের জন্য ক্ষতিকরও হতে পারে। এর উদাহরণ আমাদের সামনেই বিদ্যমান। অতীতে বিজ্ঞান একদিকে যেমন মানুষের আরাম-আয়েশের উপকরণ তৈরি করেছে; অন্যদিকে তার ভুল ব্যবহারের ফলে গোটা দুনিয়াকে নিরাপত্তাহীনতা ও অশান্তির জাহান্নামে পরিণত করেছে। যাতায়াতের জন্য দ্রুতগামী বাহন

বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমাও তারই আবিষ্কার। সুতরাং মহান আল্লাহর বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী যখন বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা যায় তখনই কেবল তার দ্বারা সঠিক কল্যাণ লাভ করা সম্ভব।

২. দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানের গবেষণা দুই ধরনের। এক হলো, প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধরনের গবেষণা কখনো কুরআন ও সুন্নাহের বিপরীত হয়নি এবং হতেও পারে না। বরং বাস্তব সত্য হচ্ছে, এই ধরণের গবেষণা সব সময় কুরআন ও সুন্নাহকে আরো বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করেছে। কুরআন ও সুন্নাহ্র এমন অনেক বিষয় রয়েছে – যা কিছুদিন আগেও মানুষের বুঝতে কষ্ট হত। বিজ্ঞানের আবিষ্কার সেটা বুঝতে অনেক সহজ করে দিয়েছে। যেমন মেরাজের সময় বোরাকের যে দ্রুতগমনের কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আগের কালের তথাকথিত জ্ঞান পূজারীরা তাকে অসম্ভব মনে করত। অথচ আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, দ্রুতগমন এমন একটি বৈশিষ্ট্যের নাম যার নির্দিষ্ট কোন সীমা রেখা নেই।

দ্বিতীয় প্রকার বৈজ্ঞানিক দর্শন প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিবর্তে শুধুমাত্র অনুমান, ধারণা অথবা অপূর্ণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী এখনো নিশ্চিত ফলাফলের সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারেনি। এই ধরণের আবিষ্কার কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআনের বিপরীত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সহজ-সরল পথ হচ্ছে, কোন প্রকার তাবীলী ব্যাখ্যা ছাড়াই কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণার উপর পূর্ণ ঈমান রাখতে হবে। বিজ্ঞানের যে আবিষ্কার কুরআনের বিরোধিতা করে তার সম্পর্কে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, অপূর্ণ জ্ঞানের কারণে বিজ্ঞান এখনো মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেনি। মানুষের বৈজ্ঞানিক ধারণা যতই সমৃদ্ধ হতে থাকবে কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত তথ্য ততই সুস্পষ্ট হতে থাকবে।

যেমন কিছু বিজ্ঞানীর ধারণা, আসমানের কোন অস্তিত্ব নেই। তাদের এই ধারণা এর উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যে, আসমানের অস্তিত্ব না থাকার পিছনে কোন অকাট্য দলিল পাওয়া গেছে। বরং তাদের দলিলের সারাংশ হল; আসমানে অস্তিত্বের কোন ইল্‌ম আমাদের নেই; এ কারণে আমরা আসমানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করি। অন্য কথায়, এই ধারণা অস্তিত্বহীনতার সুস্পষ্ট

জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা – যারা কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্যতার উপর ঈমান রাখি – পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, বিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্ত একেবারে ভুল। সঠিক তথ্য হল, কুরআন ও সুন্নাহর ঘোষণা মুতাবেক আসমানের অস্তিত্ব সত্য। কিন্তু অপূর্ণ জ্ঞানের কারণে বিজ্ঞান এখনো সেই সত্য আবিষ্কার করতে পারেনি। মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভান্ডার প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকলে হয়ত এক দিন বিজ্ঞানীদের এই ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাবে। এবং আসমানের অস্তিত্বের কথাও স্বীকার করে নিবে, যেভাবে এমন বহু বস্তুকে বর্তমানে তারা স্বীকার করে নিয়েছে যেগুলো পূর্বে অস্বীকার করা হত।

সমস্যা হচ্ছে আজ-কাল আমাদের প্রত্যেক বস্তুকে তার স্ব-স্থানে রেখে চিন্তা করার মানসিকতা হারিয়ে যাচ্ছে। কোন বস্তুর গুরুত্ব অন্তরে গেঁথে বসলে সেখানে সীমালঙ্ঘন হতে থাকে। কোন সন্দেহ নেই যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। বিশেষত বর্তমান যুগে মুসলমানদের জন্য এ বিষয়টির গুরুত্ব সীমাহীন। এবং এক্ষেত্রে উন্নতির জন্য নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালানো একান্ত অপরিহার্য। এ ছাড়া বর্তমান যুগে মুসলমানদের যথার্থ অবস্থান লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, কোন বিজ্ঞানী নিজের ধারণা বা অনুমানের উপর ভিত্তি করে যে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে, তাকে ওহীর মত গ্রহণ করে নিতে হবে। এবং এর ভিত্তিতে কুরআন-সুন্নার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। বিশেষতঃ যখন প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়শই বদলাচ্ছে।

স্মরণ রাখতে হবে ইসলাম খৃষ্টান ধর্ম থেকে আলাদা প্রকৃতির ধর্ম। আধুনিক যুগচাহিদা এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার দাবী মুকাবেলা করতে পারে – এতটুকু জীবনী শক্তিই ছিল না খৃষ্টান ধর্মে। এ কারণে বিজ্ঞান তার সামনে এক মহা সঙ্কট হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই প্রেক্ষাপটে তাদের গির্জার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে – হয় বিজ্ঞানের বিরোধিতা নয় ধর্মে পরিবর্তন সাধন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শুরুতে রোমান ক্যাথেলিক চার্চ প্রথম পথ অবলম্বন করে। আর সর্ব সাধারণের উপর তাদের প্রভাব বলয় প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে গ্যালিলিও এর মত বিজ্ঞানীকেও অসংখ্য

প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হয়েছে। কিন্তু গির্জার প্রভাব যখন শিথিল হয়ে পড়ল, তখন ধর্মের কাট-ছাট করে নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা ছাড়া তাদের আর কোন পথই খোলা রইল না। ফলে আধুনিকপন্থীরা এই পথই অবলম্বন করে।

কিন্তু এ সবের মূল কারণ, খৃষ্ট ধর্মকে অত্যন্ত অপ্রাকৃতিক এবং অগ্রাহ্য ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়েছিল। ইসলামের ব্যাপারটি এর সম্পূর্ণ উল্টো। এটা প্রকৃতির ধর্ম। মেধা ও আকলের কোন যুক্তিই একে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। যুগের সকল চাহিদা মিটানোর এবং প্রত্যেক যুগের আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তের সাথে সমতালে চলার যোগ্যতা ইসলামের রয়েছে। সতুরাং ইসলামের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিজ্ঞানের বিরোধিতা করারও প্রয়োজন নেই, আবার ইসলামকে পরিবর্তনেরও দরকার নেই। কারণ, আমাদের স্থির বিশ্বাস, বিজ্ঞান যতই উন্নতি লাভ করবে এবং মানুষের জ্ঞান ভান্ডার যতই প্রসারিত হবে ইসলামের সত্যতাও ততই সুস্পষ্ট হতে থাকবে। শর্ত হলো, মানুষের চিন্তাধারা সঠিক অর্থে সায়েন্টিফিক হতে হবে। অনুমান ও ধারণাকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের স্থান দেয়া চলবে না।

এটাই উলামায়ে দ্বীনের বক্তব্য। সার কথা হলো, প্রত্যেক বস্তুকে তার সঠিক অবস্থানে রাখতে হবে। আবেগ তাড়িত হয়ে সীমা অতিক্রম করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আশ্চর্য হল, এই নিরপেক্ষ ও শত ভাগ যুক্তিপূর্ণ কথার দরুণ কিছু লোক বরাবর প্রচার করছে যে, আলেমগণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরোধী। এ বিষয়ে অগ্রগতির বিন্দুমাত্র ফিকির নেই। এই অপবাদের উত্তরে আমরা তাদের জন্য শুধু এই দু'আই করি, আল্লাহ তাদের শুভবুদ্ধি দান করুন।

ইসলাম ও মহাশূন্য অভিযান

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বিগত দিনসমূহে চাঁদে পৌঁছে যে ঐতিহাসিক সফলতা দেখিয়েছেন, তাতে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি এখন তাদের দিকে। প্রাচ্য-প্রতীচ্য জুড়ে সেই মানব মেধারই জয় ডঙ্কা বেজে উঠেছে, যাদের অভিযানের জাল মহাশূণ্য অতিক্রম করে চাঁদের পিঠে গিয়ে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছে। সন্দেহ নেই অষ্টম অ্যাপোলো এবং দশম অ্যাপোলোর বিষ্ময়কর অভিযান মানুষের মেধাশক্তির বিষ্ময়কর কৃতিত্ব। তাঁরা যে অবিস্মরণীয় সাফল্য লাভ করেছেন সেটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবীদার। এবং তাঁরা কলা ও প্রযুক্তি, হিসাব ও অনুমানের বিশুদ্ধতা এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দূরদর্শিতাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন।

মহাশূন্যযানের মাধ্যমে প্রথমবার মানুষ অতি নিকট থেকে চাঁদকে অবলোকন করেছে। আজ থেকে একশ বছর আগে যদি কেউ বলত, মানুষ শূন্যে ভেসে একেবারে চাঁদের নিকটে পৌঁছে গেছে এবং সে চাঁদের উপর থেকে পৃথিবীর উদয় হওয়ার দৃশ্য দেখেছে, তাহলে সেটা আলিফ লায়লার কাহিনীর মতো শুনাতো। কিন্তু আজ এই ঘটনা বাস্তব হয়ে সামনে এসেছে। এখন ২০শে জুলাই পর্যন্ত দু'ব্যক্তির চাঁদে অবতরণের প্রস্তুতি চলছে। অবাক হবার কিছু নেই যে, পাঠকদের কাছে যখন এই লেখা পৌঁছবে তখন হয়ত বিজ্ঞানের ইতিহাসের এই বিস্ময়কর ঘটনা বাস্তব হয়ে ধরা দিবে।

মূলতঃ নভোযান প্রেরণ থেকে শুরু করে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত এই মহাশূন্য ভ্রমণের প্রতিটি স্তরই একজন সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই অভিযান একটি অবিষ্মরণীয় কাজ – যা ভুলা যায় না।

কিন্তু এটি চিত্রের একটি দিক মাত্র। এই বিরাট কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য এবং পরিণামের উপর চিন্তা করলে হারুনুর রশীদের যুগের একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। এক ব্যক্তি তাঁর দরবারে বিষ্ময়কর কিছু নৈপূণ্য দেখানোর অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। তারপর অনুমতি পেয়ে লোকটি দরবারে এসে উপস্থিত হল। তারপর কার্পেটের মাঝমাঝি স্থানে একটি সুই দাঁড় করিয়ে হাতে আরো কয়েকটি সুই নিয়ে সে অদূরে দাঁড়ালো। এরপর কার্পেটে দাঁড় করানো সুই লক্ষ্য করে একটি সুই নিক্ষেপ করল। দেখা গেল, চোখের পলকে সুইটি কার্পেটে দাঁড় করানো সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পার হয়ে গেছে। এরপর আরো একটি সুই হাতে নিয়ে সেটাকেও আগের মতো কার্পেটে দাঁড় করানো সুইয়ের ভিতর দিয়ে পার করে দিল। এভাবে একের পর এক কয়েকটি সুই নিক্ষেপ করল এবং সবগুলো সুই লক্ষ্য ভেদ করে গেল। একটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না।

হারুনুর রশীদ এই চমৎকার নৈপূণ্য দেখে সেই ব্যক্তিকে পুরস্কার হিসেবে দশটি দিনার এবং দশটি বেত্রাঘাত লাগানোরা নির্দেশ দিলেন! উপস্থিত সভাসদ এই আশ্চর্য ধরণের পুরস্কারের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দশ দিরহাম তার মেধা, অব্যর্থ নিশানা এবং দৃঢ় সংকল্পের পুরষ্কার। আর দশ বেত্রাঘাত তার এই কাজের শাস্তি যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতাকে সে এমন একটি কাজে ব্যয় করেছে, যাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কোন লাভ নেই।

হারুনুর রশীদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ঘটনাটি বর্তমান যুগের মহাশূন্যে অভিযানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। আসলে চাঁদে পৌছার বিস্ময়কর কৃতিত্বের জন্য একদিকে সেই সব বিজ্ঞানীদের প্রশংসা এবং ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে হয় যারা নিজ মেধা, যোগ্যতা এবং সংকল্প ও সাহসিকতার এক দুর্লভ রেকর্ড স্থাপন করেছেন। কিন্তু যখন মনে পড়ে যে, এই অভিযানে যে পরিমাণ মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক শক্তি ব্যয় হয়েছে সেই তুলনায় মানুষের লাভ হয়েছে কতটুকু ? তখন এই কৃতিত্বকেই এমন এক আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে মনে হয়, যার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই।

এ ব্যাপারে যেহেতু নানা রকমের ভুল বুঝাবুঝি মাথায় ঘুরপাক খায় তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

সরল প্রাণ সাধারণ মানুষের এক শ্রেণী আছে যারা মনে করে, চাঁদ এবং মহাশূন্য জয়ের এসব প্রচেষ্টা ইসলাম ও কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী এবং এর দ্বারা (মাআযাল্লাহ) খোদায়ী শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এমন কি ইসলামের মহব্বতে কাউকে এমনও বলতে শোনা গেছে যে, চাঁদে পৌঁছার সব খবর মিথ্যা এবং তার উপর কোন আস্থা রাখা যায় না।

কিন্তু আমেরিকা বা রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা যদি মহাশূন্য অতিক্রম করে চাঁদে বা কোন গ্রহে পৌঁছে যায় তাতে কোনভাবেই কুরআন-সুন্নাহ্ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না; এবং খোদায়ী শক্তির উপরও (মাআযাল্লাহ) কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায় না। কুরআনের কোন আয়াতে বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন হাদীসে এ কথা কোথাও বলা হয়নি যে, কোন মানুষ চাঁদে বা গ্রহে পৌঁছাতে পারবে না।

বরং মহাশূণ্যের নভোচারীরা যদি অন্তরদৃষ্টি খুলে রেখে উপরে ওঠে, তাহলে পদে-পদে কুরআন- সুন্নাহ্‌র সত্যতার সুস্পষ্ট দলিল তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। দেখতে পাবে, মিথ্যা যুক্তি পূজারীরা ইসলামের যে সব বিষয় নিয়ে উপহাস করত, বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি তাকে মানুষের ক্ষুদ্র মেধার কতটা নিকটে নিয়ে এসেছে। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিরাজে গমনের সময় 'বুরাক' এর যে দ্রুত গমনের আলোচনা হাদীসে এসেছে, কাল পর্যন্ত তথাকথিত যুক্তিবাদের ধ্বজাধারীরা তাকে জ্বীন পরীর কাহিনী বলে বিদ্রুপ করেছে। কিন্তু বর্তমান যুগের নভোচারীরা এক ঘন্টারও কম সময়ে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করে এটা কি প্রমাণ করে দেন নি যে, গতি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যাকে নির্দিষ্ট সীমানায় সীমাবদ্ধ করা যায় না ? সুতরাং আমেরিকার নভোচারীরা তাদের সীমিত মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে যদি এমন বিস্ময়কর দ্রুতগতি দেখাতে পারে; তাহলে মহাবিশ্বের প্রতিপালকের অসীম শক্তি এর চেয়ে বেশী দ্রুতগতি সৃষ্টি করতে পারবে না কেন ?

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে – কোন বস্তুই এই বিশ্বাসকে দুর্বল করতে পারবে না – যে, বিজ্ঞানের উন্মুক্ত ময়দানে মানুষের জ্ঞান ভান্ডার যতই প্রসারিত হবে ততই কুরআন-সুন্নাহ্‌কে সত্য বলে প্রমাণ করবে এবং তার

সামনে মানুষকে মাথা নত করে দিতে হবে। শর্ত হল, বিজ্ঞান যদি তার কর্মসীমা অতিক্রম না করে এবং ধারণা বা অনুমানকে পরীক্ষা-নীরিক্ষা লব্ধ জ্ঞানের সমমর্যাদা দিয়ে না বসে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত ধর্ম বিকৃত খৃষ্টধর্ম নয় যে, তাকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ভয়ে চোখ বুজে বসে থাকতে হবে। এটা সেই প্রকৃতির ধর্ম যে চৌদ্দশত বছর আগে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল ঃ

سَنُرِيْهِمْ آيٰتِنَا فِي الآ فَاقِ وَفِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَتّٰي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব দিগন্তে এবং তাদের অস্তিত্বের মাঝে; যাতে তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এটা (আল্লাহর দ্বীন) সত্য।" (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ : ৫৩)

ইমাম রাযী (রহঃ) সালাফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন أفاق এরনিদর্শনাবলীর অর্থ আসমান, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং পৃথিবীর চার মৌলিক ধাতুর বিস্ময়কর রহস্য। আয়াতে বলা হয়েছে 'আমার নিদর্শনাবলী দেখাব' – এ প্রসঙ্গে ইমাম রাযী উল্লেখ করেন ঃ

إن العجائب التي أودعها الله تعالي في هذه الأشياء مما لا نهاية لها
فهو تعالي يطلعهم علي تلك العجائب زمانا فزمانا

"মহান আল্লাহ ঐসব জিনিষে যে বিস্ময়কর রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন তার কোন শেষ নেই। সুতরাং মহান আল্লাহ ক্রমান্বয়ে তার বান্দাদেরকে বিস্ময়কর রহস্যের বিষয়সমূহ উদঘাটন করে দেখাবেন।"

(তাফসীরে কাবীর, পৃ: ৩৮৪, খ: ৭)

অন্যদিকে মুসলমানদের এক শ্রেণীর চোখ আজ বিজ্ঞানের তীব্র আলোকচ্ছটায় এমনই অন্ধ হয়ে গেছে যে, তাদের কাছে মহাশূন্যে রকেট প্রেরণের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয় ও অনুসরণযোগ্য কোন কাজই নেই। এমন মুগ্ধচিত্তে এবং তীব্র আকাঙ্খা ও আক্ষেপের সাথে তারা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির আলোচনা করে যেন তারা বলতে চায় যে, মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারী এবং পৃথিবীর সর্বাধিক সৌভাগ্যবান ও সর্বোত্তম জাতি

তারাই যাদের সন্তানেরা এই কৃতিত্ব দেখাল। আর বড়ই দুর্ভাগ্য সেই জাতির যারা এই মহান কাজে পিছিয়ে রয়েছে।

অনেকের মুখে একথাও শুনতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবী আজ গ্রহ, নক্ষত্র জয়ের পিছনে ছুটছে আর মুসলমানগণ নামায, রোযা ও বিয়ে, তালাক এর মাসআলা নিয়ে পড়ে আছে। এই বাক্যে সেই মোহাবিষ্ট মানসিকতারই পরিচয় মিলে যারা মনে করে, রকেট এবং কৃত্রিম উপগ্রহ আবিষ্কারের পর পশ্চিমা জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অন্য জাতির তুলনায় অগ্রগামী হয়ে গেছে। অতএব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এখন তাদের অনুকরণের মাঝে অনুসন্ধান করা জরুরী।

মূলতঃ এই দুই চিন্তাধারাই ভুল এবং বিপদজনক। একথা বলতে আমাদের কোনই দ্বিধা নেই যে, এটি একটি বিস্ময়কর কৃতিত্ব এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা মানুষের বিরাট সাফল্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই 'কৃতিত্ব' সম্পন্ন করতে মানুষকে যে মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে তার বিবেচনায় কি এটি সম্পাদনের যোগ্য ছিল?

অষ্টম অ্যাপোলো ও দশম অ্যাপোলোর সফলতা থেকে স্বাদ গ্রহণকারী তো অনেকেই আছেন। কিন্তু খুব কম লোকই জানেন যে, এর এক একটা অভিযানে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। শুধু অষ্টম অ্যাপোলো যাতায়াতে যা ব্যয় হয়েছিল তার পরিমাণ ছিল বার হাজার কোটি টাকা।

(জঙ্গ, করাচী, ১৪ জানুয়ারী, ১৯৬৯ইং)

উল্লেখ্য যে, এই অর্থ কম পক্ষে পাকিস্তানের বিশ বছরের বাজেট এবং ছয় বছরের জাতীয় আয়ের সমপরিমাণ। অর্থাৎ যত টাকা পাকিস্তান সরকার বিশ বছরে খরচ করে এবং দশ কোটি মানুষ ছয় বছরে যত অর্থ উপার্জন করে তা শুধু একবার মহাশূণ্য অভিযানেই ব্যয় করা হয়েছে।

এটা ছিল অষ্টম অ্যাপোলোর ব্যয়। দশম অ্যাপোলোর ব্যয় হবে এর চেয়েও কয়েকগুণ বেশী। আর ১৬ই জুলাই যে নভোযানটি দুই ব্যক্তিকে নিয়ে চাঁদে অবতরণের জন্য যাত্রা করেছে তার ব্যয়ের পরিমাণ এর চেয়েও কয়েকগুণ বেশী। এর অর্থ হল, পাকিস্তানের মতো একটি দেশ সত্তর-আশি

Contents

বছরে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করত, তারা তা জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত এই চার নভোযানেই খরচ করে ফেলেছে।

প্রশ্ন জাগে, ক্ষুধা ও দারিদ্রের আহাজারিতে পৃথিবীর দিগন্ত যেখানে ভারী হয়ে উঠেছে, কোটি-কোটি আদম সন্তান পেট ভরে দুমুঠো খেতে পায় না, ঔষুধ-চিকিৎসার অভাবে যেখানে অসংখ্য মানুষ ছটফটিয়ে জীবন হারাচ্ছে, যেই জনপদের অর্ধেক বাসিন্দা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত; সেখানে কোটি, হাজার কোটি নয়, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা এমন লোক কি করে ব্যয় করতে পারে যার অন্তরে মানবতার জন্য সামান্যতম সহানুভূতি আছে?

পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কথা ছেড়েই দিলাম। যেই আমেরিকা এই বিশাল সফলতার গৌরব অর্জন করেছে সেখানে যে মাসে অষ্টম অ্যাপোলোর জন্য বার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল ঠিক সেই মাসেই একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল যে, সেখানে প্রতি নয়জন মানুষের মধ্যে একজন দরিদ্র এবং 'দারিদ্র আজকের সবচেয়ে বড় বৈষয়িক সমস্যা।'

(সাপ্তাহিক টাইম, নিউইয়র্ক, ২৪ জানুয়ারী ১৯৬৯ ইং পৃ: ২১)

সুতরাং সে দেশে চাঁদে পৌছার অর্থহীন ফুর্তি উড়াতে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করার সাথে বুদ্ধিমত্তা, ইনসাফ ও মানবকল্যাণের মিল কোথায়?

শেখ সাদী (রাহঃ) মনে হয় আজকের শূন্যচারীদের লক্ষ্য করেই বলেছিলেন ঃ

تو کار زمیں را نکو ساختی
کہ با آسمان نیز پرداختی

"সুন্দর করে তুলি কাজ-কর্ম এ ধরার,
আসমানের সাথেও সম্পর্ক গড় গভীর।"

অর্থাৎ, তুমি আকাশেও উড়ে বেড়াচ্ছ অথচ ভূ-পৃষ্ঠের কাজ কর্মে তুমি এখন নিরত।

প্রতীচ্যের কোন ব্যক্তি এই মহাশূন্য অভিযানের অন্যরূপটি দেখাতে চাইলে তাকে বলা যেতে পারে যে, লোকটি পাশ্চাত্যের অগ্রগতিতে

প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে। তাই এ বিষয়ে পাশ্চাত্যেরই এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদের মন্তব্য শোনে নিন। সম্প্রতি এই বিষয়ে বৃটেনের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক ড. আর্নলড টাইন বি এর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তার কিছু অংশের সংক্ষিপ্ত তরজমা পাকিস্তান টাইমসের সৌজন্যে তুলে ধরছি। তিনি এই বিস্ময়কর সাফল্য স্বীকার করে নেয়ার পর লিখেছেন ঃ

"কিন্তু আজও আমেরিকার অধিবাসীদের শতকরা দশজন বা বিশজন মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। সারা পৃথিবীকে এক করে দেখলে তার ক্রমবর্ধমান জনবসতির এক তৃতীয়াংশ লোক কেবল সঠিকভাবে আহার জোগাড় করতে পারে। সুতরাং মিসরের পিরামিড নির্মাণ বা চাঁদে পৌছার মত নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত হওয়া আদম সন্তানের অর্থনৈতিক শক্তির সঠিক ব্যয়-ক্ষেত্র কখনোই হতে পারে না। এটা অপরাধের অন্তর্ভূক্ত।

"আজকের পৃথিবী তিন যুদ্ধে লিপ্ত। এখানে হরতাল-ধর্মঘটের প্রবণতা খুব বেশী। ছাত্রগণ আন্দোলন করে। অবলম্বন করা হয় সন্ত্রাসের বিভিন্ন পন্থা। এ সবই হচ্ছে এই নির্লজ্জ অনুভূতির আশ্রয় থেকে যে, যদি কোন লোক কষ্ট পায় তাহলে শক্তিই একমাত্র পন্থা, যার দ্বারা সে তার স্বজাতীয় লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

"রাশিয়া ও আমেরিকার লোকেরা এই মহাশূন্য অভিযানে একে অপরকে মোবারকবাদ দিচ্ছে। অথচ তাদের এই বন্ধুত্বপূর্ণ বিদ্বেষই মূলতঃ এই নির্বুদ্ধিতার প্রধান কারণ। পৃথিবীর একটা ছোট উপগ্রহের উপর এই দুই পরাশক্তি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী না হলে এই নির্বুদ্ধিতার চর্চা হত না।

'যেদিন থেকে মানুষের কর্মকান্ডের রেকর্ড (ইতিহাস আকারে) আমাদের কাছে বিদ্যমান সেদিন থেকেই মানুষের টেকনিক্যাল উন্নতি ও নৈতিক অবনতি পরস্পর অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়কর 'সাফল্যের ইতিহাস'। কিন্তু আমাদের নৈতিকতা ও চারিত্রিক ইতিহাস, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস ব্যর্থতার আক্ষেপপূর্ণ উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে। এটা ঐ নৈতিক শূন্যতাই – যা ১৯৪৫ সালের পর এত বেশি ব্যাপকতা লাভ করেছে যে,

সর্বনাশের বান ডেকে আনার জন্য সে এক বিরাট রাস্তা উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

"এই এটমের যুগে প্রথমত আমাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে যে, আমরা যেন অন্য মানুষের জীবন কেড়ে নেয়ার অপরাধ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি। এর জন্য একটি আন্তর্জাতিক সরকার গঠন করে স্থানীয় প্রশাসনকে তার অধীনে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এখন এ কাজ চাঁদে অবতরণের চেয়েও বেশি সমস্যা-সংকুল হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ, এখন জাতীয়তাবাদের ধারণা আমাদের কাধে প্রেতাত্মার মতো চেপে বসেছে। এবং এই মিথ্যা প্রভুকে পরিত্যাগ করা মহাশূন্যে অভিযানকারীর দুঃসাহসের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ও দুঃসাহস দাবী করে।

"আমাদের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরত্বপূর্ণ কাজ হবে, এই দুনিয়ার অধিবাসীদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা। আমাদের জানা নেই, জাতিগত আন্দোলন যখন সারা পৃথিবীতে গৃহীত হবে ততক্ষণে পৃথিবীর জনবসতি কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। তবে এতটুকু জানি যে, পৃথিবীর খাদ্য সম্ভার বৃদ্ধির জন্য একটি মুহূর্তও নষ্ট করা উচিৎ নয়। প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির প্রভাব এমন হওয়া উচিৎ যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে (উৎপাদনে) উন্নতির গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর করা যায়।

"মানব সন্তানের কাছে এই মুহূর্তে এই দুটি উদ্দেশ্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু 'চন্দ্র অভিযান' এই উদ্দেশ্যের কোনটাই পূর্ণ করতে পারে না।

"সুতরাং 'মহাশূন্য অভিযান' একেবারেই অনর্থক খাটুনি। আর আমরা এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আপন চেষ্টা-তদবির ব্যয় করে জেনে-শুনে এক মস্ত বড় অর্থনৈতিক ক্ষতির বোঝা জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছি। যে মুহূর্তে অগণিত আদম সন্তান দ্রুত দারিদ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদেরকে অর্থনৈতিক বিষয়টি উপেক্ষা করা উচিৎ হবে না।

"তবে প্রশ্ন হতে পারে, যদি শূন্যাভিযানের উদ্দেশ্যকে আমাদের এজেন্ডার সর্বশেষ আইটেমে স্থান দিই এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্যকে একেবারে পাল্টে দিই তাহলে আমাদের আবিষ্কারকদের সাহস, বিশেষজ্ঞদের পান্ডিত্য এবং আমাদের বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিকল্প ক্ষেত্র কী হবে ? এই প্রশ্নের

উত্তর জাপানে আগেই দেয়া হয়েছে। যুদ্ধবাজি এবং শূন্যবাজির পরিবর্তে আমাদের গবেষণার ক্ষেত্র হওয়া উচিৎ সমুদ্র – সমুদ্রের ব্যাপারে গবেষণা করে তার সম্ভাব্য উপকরণকে কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি।

"নিকটতম উপগ্রহ থেকেও সমুদ্র মানুষের অভিযানের নাগালে। আমাদের পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ আয়তন জুড়ে রয়েছে এই মহাসমুদ্র। অজানা সম্পদের এক বিশাল ভান্ডার এর নিচে বিদ্যমান। অনুমান করা যায় যে, সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল ভান্ডারের সবচেয়ে বড় অংশ, যা আজও অনাবিষ্কৃত।

"বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এটা সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। এটা গবেষণার আকাঙ্খা পুরণের পাশাপাশি এ নিশ্চয়তাও সে দিতে পারে যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানের চেয়ে দশগুণ বৃদ্ধি পেলেও কেউ না খেয়ে মরবে না।

"একটি সুস্থ-সবল মাছ একবারে এক মিলিয়ন ডিম দেয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ ডিম থেকে মাত্র তিনটি মাছ জন্ম নেয় – যারা ভবিষ্যতে ডিম দেয়ার উপযুক্ত। কিন্তু জাপানী জেলেরা যখন ডিমগুলোর যোগ্যতা কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে এবং শিকারী প্রাণীর হাত থেকে ডিমগুলো রক্ষা করে সেগুলো লালন-পালন করেছে তখন এক মাছের ডিম থেকে জন্ম নেয়া মাছের সংখ্যা এক লাখে দাঁড়িয়েছে।

"অষ্টম অ্যাপোলো যখন তার সফল অভিযান শেষে ফিরে এলো ঠিক তার কয়েক ঘন্টা পর আটলান্টিক উপকূল থেকে আমার নিকট একটি টেলিফোন আসে। আমাকে প্রশ্ন করা হলো- 'আপনার দৃষ্টিতে এটা কি মানব ইতিহাসের এক বিরাট বৈপ্লবিক ঘটনা?' আমার উত্তর ছিল, 'না!'

"আমার উত্তর 'হ্যাঁ'ও হতে পারত। যদি সে দিনের খবরটি হত – হঠাৎ মানুষের হুঁস ফিরে এসেছে এবং তারা এক বিশ্ব রাষ্ট্রের অধীনে অনুগত করে দিয়েছে স্থানীয় রাজ্যগুলোকে এবং তাদের গবেষণা সমুদ্র এবং সমুদ্রের তলদেশে পৌছে এমন জিনিষ আবিষ্কার করেছে যা বিশ্ব রাষ্ট্রের মানব সন্তানের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ব্যবহার হবে। আমাদেরকে এখন এই সত্যিকার বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে হবে। আর এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পদক্ষেপ এটাই হওয়া উচিৎ

যে, যে উপাদান তারা মহাকাশ অভিযান ও অস্ত্র তৈরির পিছনে অপচয় করছে তার গতি মানবকল্যাণের সামগ্রিক উন্নতির দিকে ফিরানো। যদি তা করা যায় তাহলে সারা দুনিয়ার অধিবাসীদেরকে আমেরিকার আশিভাগ অধিবাসীর জীবন-যাত্রার মানে উন্নীত করা সম্ভব।

"এটা নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক ঘটনাই হবে। তবে শুধু প্রযুক্তি দ্বারা এই উদ্দেশ্য লাভ করা যাবে না। প্রযুক্তির শক্তি থেকে যদি সুমিষ্ট ও ক্ষতিমুক্ত ফল পেতে হয় তাহলে প্রয়োজন এক অধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটানো। এই আধ্যাত্মিক সার্জারী আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। এটা ছাড়া আমাদের নতুন আবিষ্কৃত বৈষয়িক উপকরণ একেবারে অর্থহীন। এটা ব্যতীত আমরা চাঁদে পৌঁছে গেলেও সেখানে যে মাটি ও ছাই মিলবে সেটা হবে আমাদের আধ্যাত্মিক দেউলিয়াপনার উপর নিকৃষ্টতম বিদ্রুপ। এর থেকে আমরা আমাদের মাতৃভূমিতে বসবাস করেও মুক্তিলাভ করতে পারব না।"

(পাকিস্তান টাইমস, ৬ জানুয়ারী ১৯৬৯)

ড. টাইন বি. তাঁর এই প্রতিবেদনে যথার্থই সঠিক রোগ নির্ণয় করেছেন। যদি আপনি তার কারণ নিয়ে চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন, এইসব রোগের শিকড় হচ্ছে, যারা আজ চাঁদের পিছনে দৌড়াচ্ছেন তাঁদের সামনে জীবনের কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং ইপ্সিত গন্তব্য নেই। তাঁদের সকল কর্মকাণ্ডের রাস্তা অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে বালক সুলভ চাপল্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে। ফলে মানবতার শান্তি ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্য লাভের জন্য বিশ্বজয়ের অমিত সম্ভাবনাময় যোগ্যতাকে তাঁরা কাজে লাগাচ্ছেন না। তাঁদের সকল প্রচেষ্টা একে অপরের সাথে লড়তে, প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হতে এবং একে অপরকে পরাজিত করার কাজে ব্যয় হচ্ছে। প্রতিযোগিতার টানা-হেঁচড়ায় তারা নিজেদের কী সর্বনাশ ডেকে এনেছেন, সেটাও তারা ভুলে গেছেন।

কোন প্রতিযোগিতা যত দ্রুতগতির এবং বিস্ময়করই হোক যদি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সঠিক না হয়, তাহলে সেটা মানুষের জন্য কোন উপকারী বস্তুই হতে পারে না। ড. টাইন বি. সত্য কথাই বলেছেন যে, বিজ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য রূহানী সার্জারী প্রয়োজন। কিন্তু এ কথা হয়ত তাঁরও

জানা নেই যে, এই রূহানী সার্জারী মানব সভ্যতার অগ্রদূত সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য ব্যতীত হতে পারে না। যিনি বহু আগেই চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র অতিক্রম করে এমন এক জগৎ ঘুরে এসেছেন, যেটা বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত কল্পনার চোখেও দেখতে পারে নি। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে চন্দ্র বিজয়ের পরিবর্তে 'কলব' ও 'নফস' বিজয়ের কাজে লাগিয়েছেন। পৃথিবী যতদিন তাঁর পায়ের নিচে মাথা রেখে তাঁর পথ-নির্দেশের অনুসন্ধানী না হবে ততদিন তারা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি বা চন্দ্র-নক্ষত্রে বিজয়কেতন উড়িয়ে দিলেও তাদের অশান্তি-অস্থিরতা কখনো শান্তি-স্থিরতায় পরিবর্তিত হবে না। মানুষের চাঁদে অবতরণের পর বিজ্ঞানের সকল উন্নতি মানবতার জন্য আরো ধ্বংসাত্মক রূপ নিবে। আরো বৃদ্ধি পাবে মানুষের অস্থিরতা। নির্যাতন ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার গ্রাস করবে গোটা পৃথিবীকে।

কবির ভাষায় ঃ

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا
اپنی حکمت کے خم وپیچ میں الجھا ایسا
آج تک فیصلہ نفع وضرر کر نہ سکا

মহাকাশে নক্ষত্রের সন্ধানে মহাব্যস্ততা যার,
আপনারে অনুসন্ধানের সময় মেলেনি তার।
সূর্যের আলোকে জয় করে করেছেন যিনি বাজিমাত,
জীবনের অন্ধকার রজনীতে আনতে পারেনি প্রভাত।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মায়াজালে জড়িয়ে তিনি,
অদ্যাবধি ভাল-মন্দের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি।

ইসলাম ও বিশ্বজয়

কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ সমগ্র বিশ্বকে মানুষের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন এবং তার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশকে মানুষের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। সূরা আল বাকারায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّافِي الأَرْضِ جَمِيْعًا

পৃথিবীর সকল বস্তুকে তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

(সূরা আল বাকারা ঃ ২৯)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَافِي الأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَأٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

এবং আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূ-মন্ডেলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা জাছিয়া ঃ ১৩)

এই আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ যেভাবে আপন নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা আলোচনা করেছেন তদ্রুপ সূক্ষ্মভাবে এই ইঙ্গিতও রয়েছে ঃ মহান আল্লাহ যেহেতু বিশ্বের সমস্ত বস্তু মানুষের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন; সুতরাং মানুষের কর্তব্য হল, সেই সব বস্তু নিয়ে গবেষণা করা এবং তা আবিষ্কারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এবং আল্লাহ প্রদত্ত আকল-মেধা, শ্রম-মেহনত কাজে লাগিয়ে ঐ সব উপকারী বস্তুগুলো উদ্ভাবন করা যা মহান আল্লাহ এই নভোমন্ডলও ভূ-মন্ডলের বুকে সঞ্চিত রেখেছেন। কারণ, এই বিশ্বে কিছু নিয়ামত আছে প্রকাশ্য এবং ব্যাপক-বিস্তৃত প্রকৃতির, যা থেকে প্রতিটি মানুষ

প্রতি মুহূর্তে উপকৃত হচ্ছে। আর কিছু নিয়ামত আছে অপ্রকাশ্য, যার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে মেধা, চিন্তা-গবেষণা, শ্রম-সাধনা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সুতরাং আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً

তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন ? (সূরা লুকমান-২০)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলকে মানুষের আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, মানুষের কোন চেষ্টা-সাধনা ছাড়াই বিশ্বের সকল নেয়ামত তার হাতে এসে ধরা দেবে। বরং কুরআন ঘোষণা করেছে, সেই সব নেয়ামতের মাঝে কিছু আছে প্রকাশ্য – যেগুলোর আবিষ্কারের জন্যে কোন সাধনা ও চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কিছু নেয়ামত রয়েছে অপ্রকাশ্য। যেগুলো লাভ করার জন্যে মেধা, চিন্তা, গবেষণা-অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতা, সাধনা একান্ত প্রয়োজন। অন্যত্র কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

তিনিই আল্লাহ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (সূরা জাছিয়া ঃ ১২)

এই আয়াতে সমুদ্রকে আয়ত্বাধীন করে দেয়ার কারণ বলা হয়েছে যে, মানুষ এর দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করবে। কুরআনে সাধারণত আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানের অর্থ হয় জীবিকা উপার্জনের সংগ্রাম। সুতরাং এই আয়াতের একটি ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, তোমাদেরকে সাগরে জাহাজ চালানোর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যাতে করে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে

পার। তবে কতক মুফাসসির বলেছেন, এই আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানের অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য নয়। বরং মহান আল্লাহ সমুদ্রে যে অসংখ্য নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন তার গবেষণা ও অনুসন্ধান। অর্থাৎ, আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রে অসংখ্য উপকারী জিনিষ সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা অনুসন্ধান চালিয়ে সেটা কাজে লাগাতে পর। সুতরাং বিজ্ঞানের নতুন-নতুন তথ্য প্রতিদিন এই বাস্তবতাকে পরিষ্কার করে তুলছে যে, সমুদ্রের মধ্যে এবং তার তলদেশে যেই পরিমাণ খনিজ ও উদ্ভিদজাত ধন-ভান্ডার লুকিয়ে আছে তা স্থলভাগে নেই।

কুরআন শরীফ কয়েক স্থানে পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে, গবেষণা-অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মানুষ যতই অগ্রসর হবে ততই তার সামনে বিশ্ব লোকের অনেক নতুন-নতুন রহস্য ও নেয়ামত উন্মোচিত হবে। উদাহরণত, যেখানে কুরআন যানবাহনের মধ্যে ঘোড়া, খচ্চর প্রভৃতির কথা আলোচনা করেছে সেখানে সূক্ষ্ম একটা ইশারা রয়েছে যে, ভবিষ্যতে এমন ধরনের যানবাহন আবিষ্কার হবে যা এই মুহূর্তে মানুষের কল্পনায় আসেনি। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আল্লাহ তোমাদের জন্য ঘোড়া, খচ্চর, গাধা সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার উপর আরোহণ করতে পার এবং (ভবিষ্যতে) আল্লাহ এমন জিনিষ সৃষ্টি করবেন যা তোমরা এখন জান না। (সূরা নাহল ঃ ৮)

কুরআন শরীফ এই আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আবিষ্কৃতব্য সকল যানবাহনের পূর্বাভাস দিয়ে দিয়েছে।

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের জীবনের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে এই বাণী সত্য। (সূরা হা-মীম সাজদা ঃ ৫৩)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন যে, আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের নিদর্শনাবলী প্রকাশের ধারাবাহিকতা কোন যুগেই বন্ধ হবে না। বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রতিটি যুগেই মহাবিশ্বে নতুন-নতুন সৃষ্টি রহস্য আবিষ্কৃত হতে থাকবে।

এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের আরো অনেক উদ্ধৃতি পেশ করা যাবে। কিন্তু এই কটি আয়াতের উপর চিন্তা করলে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, অনুসন্ধান-গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের মাধ্যমে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের সুপ্ত শক্তির উদঘাটন যদি বিশুদ্ধ নিয়ত ও সঠিক পন্থায় করা হয়, তাহলে কুরআনের দৃষ্টিতে সেটা নিন্দনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয়। ইসলাম এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উপর কোন ধরণের বাধ্য-বাধকতা আরোপ না করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং আরো উৎসাহিত করেছে। এই কারণে দেখা যায়, মুসলমানগণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের যে সূত্র আবিষ্কার করে গেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত আগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথ প্রদর্শন করবে।

তবে মনে রাখতে হবে ইসলাম গবেষণা ও আবিষ্কারের যে চিত্র তুলে ধরেছে সেটা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পাশ্চাত্যেও আবিষ্কারের মহড়া চালাচ্ছে। নিঃসন্দেহে তারা এই ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু ইসলামের সাথে তার সর্বপ্রথম ও মৌলিক পার্থক্য হল, পাশ্চাত্যের সংকীর্ণ দৃষ্টি বস্তুর অপর প্রান্তের কোন কিছু দেখার ও চিন্তা-ভাবনার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত। অতএব তাদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে যে নতুন বস্তু আবিষ্কৃত হয় তাকে তারা আপন শক্তি, জ্ঞান ও গবেষণা এবং শ্রম ও সাধনার ফল মনে করে। এ সব আবিষ্কারের পিছনে কোন স্রষ্টা ও মনিবের হাত চোখে পড়ে না। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টি কেবল ঐ শ্রম-সাধনা ও গবেষণা-অভিজ্ঞতার উপর গিয়েই ক্ষান্ত হয় না। বরং তার পিছনে সেই মহান স্রষ্টা ও মনিবের অসীম শক্তি অবলোকন করে যিনি একদিকে সমগ্র বিশ্বকে মানুষের আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন; অন্যদিকে শুধু মানুষকে এমন জ্ঞান, মেধা ও শক্তি দান করেছেন যার দ্বারা সে পৃথিবীর বিপুল শক্তিকে অনুগত করে নিয়েছে। সুতরাং ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে,

আবিষ্কারের কাজে কোন সফলতা লাভের পর মানুষকে অহংকার ও আত্মগৌরবে লিপ্ত না হয়ে আপন স্রষ্টা ও মনিবের দরবারে সিজদাবনত হওয়া উচিৎ। যিনি তাকে সমগ্র জগতের উপর কর্তৃত্ব করার মর্যাদা দান করেছেন। এই অবস্থায় আল কুরআনের শিক্ষানুযায়ী একজন মুমিনের আহ্বান হবে ঃ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালন কর্তার দিকে ফিরে যাব। (সূরা জুখরুফ ঃ ১৩)

আবিষ্কারের ধারণায় ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মাঝে দ্বিতীয় মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে– পাশ্চাত্যের বস্তবাদী ধ্যান-ধারণা বিশ্ব-আবিষ্কারকে চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করে। তার নিকট মানুষের জীবনের একটাই মাত্র পরম লক্ষ্য যে, সে পৃথিবীর যাবতীয় উপকারী বস্তু থেকে সর্বাধিক উপকৃত হয়ে এবং সর্বাধিক ভোগ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। এর বিপরীতে ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বজয় স্বতন্ত্র ভাবে কোন লক্ষ্যই নয়। বরং উদ্দেশ্য লাভের একটি মাধ্যম এবং মানুষের যাত্রা পথের একটি মনযিল মাত্র। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে– সমগ্র বিশ্ব থেকে খেদমত গ্রহণের অধিকার মানুষের তখনই রয়েছে যখন সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে আদায় করে। মহান আল্লাহ্ বিনা কারণে এই বিশ্বকে মানুষের হাতে বশীভূত করে দেননি। বরং উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যাতে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। সেই দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আমি মানুষ ও জিন জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। (সূরা জারিয়াত : ৫৬)

এ বিষয়ে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মাঝে তৃতীয় মৌলিক পার্থক্যটি হচ্ছে– পাশ্চাত্যের মতে বিশ্ব আবিষ্কারের গবেষণায় নতুন যে শক্তি মানুষের হাতের

নাগালে এসে পড়ে, তাকে ব্যবহারের প্রক্রিয়াও মানুষ তার আপন মেধা দিয়ে নির্ণয় করে। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে– যেই স্রষ্টা মানুষকে এই শক্তি দান করেছেন তিনিই সেটা ব্যবহারের সঠিক পন্থাও বলে দিতে পারেন। সুতরাং এই সব আবিষ্কার-উদ্ভাবন সেই পথে এবং সেই কাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে, মহান আল্লাহ্ যার অনুমতি দান করেছেন। মানুষ যখন আল্লাহর ওহীর দিক নির্দেশনাকে পাশ কাটিয়ে আবিষ্কৃত বস্তু ব্যবহারের পন্থা নিজেই নির্ধারণ করে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির এই উত্তম নিয়ামতগুলি মানুষের উপকার করার পরিবর্তে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। পরিনামে আজ চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহে বিজয় পতাকা উড়ালেও আপন জীবন অন্ধকার থেকে ঘোর অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সুতরাং ইসলামের বিশ্ব জয়ের ধারণা পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক ব্যাপক ও সার্বজনীন। এবং মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারীও। আল্লাহ্ আমাদেরকে তার সৃষ্টি রহস্যের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

ইজতিহাদ

(১৪০৪ হিজরীতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত উলামা কনভেনশনে প্রদত্ব ভাষণ।)

যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, যিনি এই বিশ্বকে দিয়েছেন অস্তিত্ব; সকল দুরূদ ও সালাম তাঁরই জন্যে, যিনি পৃথিবীতে সত্যকে করেছেন প্রতিষ্ঠিত।

মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত সুধী, আস্‌সালামু আলাইকুম।

এই কনভেনশনে – যার মূল উদ্দেশ্য ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের গতিকে তরান্বিত করা – যে সুপারিশমালা কমিটির পক্ষ হতে পেশ করা হয়েছে আমি সেগুলোকে পুরোপুরি সমর্থন করি। কমিটি যে সুপারিশগুলো প্রনয়ণ করেছে তা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। এটা কার্যকর করা গেলে মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলার যে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে, তা প্রতিহত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

এই মুহূর্তে আমি বিশেষ ভাবে ইজতিহাদের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

আমার দৃষ্টিতে এটা যেহেতু উলামাগণের একটি প্রতিনিধি সম্মেলন এবং এই মজলিসে যে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হবে সেটার প্রভাব হবে সুদূর প্রসারী। তাই ইজতিহাদের বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে। আমাদের সমাজে এ ব্যপারে বিভিন্ন ধরনের ভুল ধারণা প্রচলিত। এই পরস্পর বিরোধী ভুল ধারণার কারণে কোন সময়ে চরম বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয় ; আবার কখনো চরম শিথিলতা দেখা যায়।

আমার মতে – এটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয় বরং কুরআন-সুন্নাহ্ এবং ফকীহগণের মতামত থেকে সংগৃহীত – ইজতিহাদ একটি দুধারী তরবারী। ইজতিহাদকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে, তার সীমার মধ্যে থেকে এবং তার শর্তগুলো পুরোপুরি পালন করে ব্যবহার করা হলে তার ফলাফল

সেই বিশাল ফিকহী ভান্ডার আকারে সামনে আসবে যার উপর উম্মত নির্দ্বিধায় গর্ব করতে পারে। কিন্তু ইজতিহাদের হাতিয়ারকে ভুল ব্যবহার করলে কিংবা অযোগ্য ব্যক্তি ব্যবহার করলে অথবা ভুল পন্থায় ব্যবহার করা হলে তার ফলাফল হবে সেই ভ্রান্ত মতাদর্শ এবং দ্বীনকে বিকৃত করার সেই আন্দোলন যার ইতিহাস 'আল মিলাল ওয়ান নিহাল' এর মতো গ্রন্থে বিস্তারিত পাওয়া যায়। যাদের অবস্থা এমন যে, সুদীর্ঘকাল পৃথিবী তাদের হৈ চৈ শুনেছে, কিন্তু আজ বইয়ের পৃষ্ঠা ছাড়া কোথাও তাদের নামগন্ধ অবশিষ্ট নেই।

ইজতিহাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর কর্মপন্থা অনুসন্ধান করা যায়। আবার ইজতিহাদ দ্বারা এমন অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে : আমাদের দেশের জনৈক মুজতাহীদ কুরআনের আয়াত وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا অর্থাৎ 'পুরুষ চোর ও মহিলা চোরের হাত কেটে দাও'কে ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন, পুরুষ ও মহিলা চোর অর্থ ধনী বা পুঁজিপতি। আর হাত কেটে দেয়ার অর্থ তাদের শিল্প-কারখানাকে জাতীয়করণ করে দেয়া। এই ব্যাখ্যা এমন ব্যক্তির পক্ষ হতে আসেনি যিনি একেবারেই নির্বোধ। আমদের দেশের এমন এক ব্যক্তির পক্ষ হতে ছেপে প্রকাশিত হয়েছে যিনি নামীদামী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গণ্য।

অনুরূপভাবে ইজতিহাদের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, সূদ হারাম নয়। মদ হারাম নয়, সেটাও দাবী করা হচ্ছে এই ইজতিহাদের ভিত্তিতে। এই ইজতিহাদের উপর সওয়ার হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার মহামারী ও সকল অভিশাপকেও হালাল করার প্রচেষ্টা হয়েছে। দ্বীন বিকৃত করার এক অশেষ কর্ম-কাণ্ড শুরু হয়েছে এই ইজতিহাদকে ভিত্তি করেই।

এই কারণে আমি বলেছি, এটা দুধারী তরবারী। আমি এর দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি যে, এটা হাদীসে বর্ণিত পুলসিরাতের ন্যায় যা তরবারীর চেয়ে তীক্ষ্ম ধারালো এবং চুলের চেয়ে অধিক সরু। যদি তার যাবতীয় শর্তাবলী ও বিধি বিধান না মেনে এবং পুরোপুরি যোগ্যতা অর্জন না করে কোন ব্যক্তি এই কাজে প্রবৃত্ত হয় তাহলে সে দ্বীনকে বিকৃত করবে এবং তার দ্বারা মারাত্মক গোমরাহী সৃষ্টি হবে।

কেউ কেউ মনে করেন, ইজতিহাদ অর্থ নিজের আকল ও রায়ের উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা। তারা আকল ও বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করে ইসলামী বিধান সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে ইজতিহাদ মনে করেন। ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই এমন কাজকে ইজতিহাদ মনে করেননি। যে ব্যক্তি এটাকে ইজতিহাদ মনে করে সে ভয়ানক গোমরাহীতে লিপ্ত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত মুআজ (রাযিঃ) এর উদ্দেশ্যে বলা যে হাদীসের মাধ্যমে ইজতিহাদের পথ উম্মুক্ত করেছেন সেই হাদীসেই এই ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, কোন বিষয় কুরআনে কারীমে না থাকলে কীভাবে সিদ্ধান্ত নিবে তুমি ? হযরত মু'আজ (রাযিঃ) বললেন, সুন্নাহের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, যদি সুন্নায়ও না পাও তাহলে কী করবে ? তিনি বললেন, আপন বিবেক খাঁটিয়ে ইজতিহাদ করব। এই হাদীস সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্য় যে ব্যাপারে নির্দেশ রয়েছে, সেক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোনই অবকাশ নেই। এর পরও যদি ইজতিহাদ করা হয় তাহলে সেটা ইজতিহাদ হবে না, হবে তাহরীফ বিকৃত করন।

মূলতঃ কুরআন ও হাদীস যে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেছে সেক্ষেত্রে উন্মুক্ত ও স্বাধীনভাবে ইজতিহাদের অনুমতি দিলে, আমার মতে নবী প্রেরণের কোন উদ্দেশ্যই অবশিষ্ট থাকে না। মানুষ যে বিষয়ে আপন মেধা খাটিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে না, ওহীর মাধ্যমে তার সঠিক পথ দেখানোর উদ্দেশ্যেই নবীগণ ওহী নিয়ে আবির্ভুত হন এবং বলেন, এই রাস্তা তোমাদের জন্য। যদি বলা হত যে, তোমাদের মেধা ও বুদ্ধিতে যা ভাল মনে হয় তাই কর, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণের কোন প্রয়োজনই ছিল না। বরং বলা হত, প্রত্যেক যুগের মানুষ যেই পন্থা ভাল মনে করে, জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধির অনুকূল মনে করে এবং কল্যাণকর মনে হয় সেই মুতাবেক নিজের জীবন পরিচালনা করবে। কুরআন-সুন্নাহ্ অবতীর্ণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই কারণে, ইজতিহাদের ব্যাপারে সর্বপ্রথম এই

ভুল ধারণা দূরীভূত করা অত্যন্ত জরুরী। এই উলামা কনভেনশন থেকে যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে সে ক্ষেত্রে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।

দ্বিতীয় নিবেদন হল, অনেক ক্ষেত্রে ইজতিহাদের অর্থ যদিও নিজের বিবেক প্রসূত মতামতকে কুরআন ও সুন্নাহ্র নামে চালিয়ে দেওয়া বলে মনে করা হয় না; কিন্তু ইজতিহাদ কর্মের নাম আসতেই মনের মাঝে এরূপ কল্পনা উদয় হয় যে, আজই যেন কুরআন-সুন্নাহ্ আমদের উপর অবতীর্ন হল। এই চৌদ্দশ বছরে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের কোন কাজই হয়নি। এখন আমরা মেধা ও বুদ্ধি খাটিয়ে যে অর্থ উদঘাটন করব সেটাই হবে ইজতিহাদ এবং তাকেই বাস্তবায়িত করা উচিৎ।

এই রকম ধারনা মাঝে মাঝে প্রচার করা হয়। অথচ আজ আমরা কোন শূন্যে অবস্থান করছি না। আমরা এমন এক যুগে অবস্থান করছি, যার উপর দিয়ে চৌদ্দশ বছর সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এই সময়ের মাঝে বহু সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ী, ফকীহে উম্মত, সালেহীনে মিল্লাত অতিবাহিত হয়েছেন। যাঁরা নিজের পুরো জীবনটাই ব্যয় করেছেন এই দ্বীন অর্জনের জন্যে। কুরআন-সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে তারা এমন ত্যাগ স্বীকার করেছেন যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। অনাহারে-অর্ধাহারে বাসী পান্তা খেয়ে মোটা কাপড় পরিধান করে তাঁরা কুরআন-সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তারা আমাদের জন্যে রেখে গেছেন এক বিশাল জ্ঞান ভান্ডার। সুতরাং তাঁদের এই বিশাল ভান্ডার ছুঁড়ে ফেলে এবং উপেক্ষা করে আমরা আজ নতুন করে কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত করার চেষ্টা করব – এমন ধারণা করা হবে আত্ম-প্রবঞ্চনার শামিল।

কারণ তার অর্থ দাঁড়াবে, চৌদ্দশ বছর কুরআন-সুন্নাহ্র উপর কোন আমল হয়নি। তার কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করা হয়নি। কেউ কোনভাবেই তা বুঝতে সক্ষম হয়নি। তাই ইজতিহাদের এই অর্থও যদি কারো মনে থাকে যে, আগেরকার ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান ভাণ্ডারকে উপেক্ষা করে একেবারে গোড়া থেকে ইজতিহাদ শুরু করবেন, তাহলে আমি তাকে সমর্থন করতে পারি না। ফিকাহ্ শাস্ত্রের পূরাতন জ্ঞান ভান্ডারকে বাদ দিয়ে পুনরায় নতুন করে মাসআলা উদঘাটন করতে হবে এবং নতুন করে ফিক্হের পরীক্ষা-

নিরীক্ষা করে নতুন ফিক্‌হ তৈরি করতে হবে ইজতিহাদের এহেন অর্থ করা হলে তা মারাত্মক ফিত্‌নার কারণ হবে।

আমার তৃতীয় নিবেদন, কুরআন ও সুন্নাহ্‌ থেকে যে পুরাতন মুলনীতি উদ্ভাবিত হয়েছে তার আলোকে নুতন মাসআলাগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা; ইজতিহাদের এই অর্থ নির্ভুল এবং সঠিক। এটা নিশ্চিত যে, প্রতি যুগেই এমন কিছু মাসআলা সৃষ্টি হয় যার সুস্পষ্ট সমাধান আমরা কুরআন বা সুন্নাহ্‌য় সরাসরি পাই না। অনুরূপভাবে ফকীহগণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষনে হয়ত তার উল্লেখ থাকে না আর থাকলেও যথাযথভাবে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকে না। মূলনীতির গণ্ডির মাঝে থেকে ঐসব মাসআলার সমাধান খুঁজে বের করা এবং এজন্য বিধানদাতার উদ্দেশ্য অনুধাবণ করা ও শরীয়তের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার নাম ইজতিহাদ। আর এই ইজতিহাদের রাস্তা আজ পর্যন্ত কেউ বন্ধ করেনি।

এই ধরণের অপপ্রচার একেবারেই ভুল যে, ইজতেহাদের দরোজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর দরোজা কেউ বন্ধ করেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উম্মুক্ত দরোজা এটি। কিয়ামত পর্যন্ত এই দরোজা উম্মুক্ত। যতদিন ইজতিহাদ তার যোগ্য লোকের অধীনে থাকবে ততদিন তাকে কেউ বন্ধ করতে পারবে না। আমাদের এই বর্তমান যুগে যেটা প্রয়োজন তা তৃতীয় প্রকারের ইজতিহাদ। আমাদের সামনে এমন অনেক মাসআলার উদ্ভব ঘটেছে যার সুস্পষ্ট বিধান আমরা ইতিপূর্বে পাই না কিংবা তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান কার্যতঃ জটিলতা দেখা দিয়েছে – এমন সব মাসআলার সমাধানের জন্য ইজতিহাদের দরোজা খোলা রয়েছে।

এখানে বলতে চাই যে, এই কমিটির বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে, "পাকিস্তানে ইজতিহাদের কার্যক্রম কীভাবে আরম্ভ করা যায়।" এর গভীরে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দৃষ্টিগোচর হয় যে, এই কাজ ইতিপূর্বে হয়নি। এখন নতুন করে শুরু হচ্ছে। আমি বলতে চাই, বাস্তব অবস্থা এমন নয়। যে ইজতিহাদ কাম্য এবং এই পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর জন্য যে ইজতিহাদ প্রয়োজন, সেটা পূর্বে হয়নি বিষয়টি এমন নয়। সেটা পূর্ব থেকেই হয়ে আসছিল এবং এখন যদি তাকে কোন সাংগঠনিক রূপ দেয়া হয় এবং তার

উপর কাজ করা হয় তাহলে সেটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ হবে। কিন্তু এটা ভাবা ভুল হবে যে, উলামায়ে কিরাম এর আগে ইজতিহাদ করেননি। যে ধরণের ইজতিহাদ কাম্য তা পূর্বেও করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

পূর্বে আমি যে বক্তব্য পেশ করলাম, তা ছিল মূলনীতি সংক্রান্ত কিছু কথা। এই মুহূর্তে আমাদের সামনে যে সুপারিশ করা হয়েছে তাহল, উলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করা যারা ইজতিহাদী দায়িত্ব পালন করবেন এবং ঐসব মাসআলার ব্যাপারে নিজস্ব মতামতগুলো তুলে ধরবেন। এক্ষেত্রে আমার একটি উসূলী নিবেদন আছে। চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসের দিকে নজর বুলালে আপনি একথা বুঝতে পারবেন যে, ইসলাম ইজতিহাদের জন্য খৃষ্টধর্মের ন্যায় এমন কোন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংগঠন কায়েম করেনি; যাদের কথাই চূড়ান্ত হবে এবং তার উপর অন্য কারো কিছু বলার অবকাশ থাকবে না – এমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের অস্তিত্ব আপনি ইসলামে খুঁজে পাবেন না। খৃষ্টধর্মে এরূপ রীতি প্রচলিত আছে যে, পোপ যা বলবেন, যেভাবে দ্বীনের ব্যাখ্যা করবেন তার উপর কারো কিছু বলার অধিকার থাকে না। তাকে সকল প্রকার ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে এবং পুতপবিত্র (infallible) মনে করা হয়।

ইসলামী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন কায়েম করে তার হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয় নি। বরং আলেমগণের ইজতিহাদের মাধ্যমে যে মতামতগুলো সামনে আসে তার উপর অন্য উলামায়ে কিরামের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। অবশেষে কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে বিষয়টি সঠিক কি ভুল তা প্রমাণিত হওয়ার ফয়সালা কেবল এভাবেই হতে পারে যে, মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত বিবেক কোন্ ইজতিহাদটিকে গ্রহণ করেছে আর কোনটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং ইজতিহাদের জন্যে কোন বোর্ড গঠন করার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানটি হবে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে চূড়ান্ত মতামতের অধিকারী এবং তার বিপরীতে অন্য আলেমগণের জন্যে দ্বিতীয় কোন মতামত প্রদানের কোন রাস্তাই অবশিষ্ট থাকবে না; তাহলে এটাও আমার দৃষ্টিতে সঠিক নয়।

চতুর্থ কথা হল, ইজতিহাদের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নির্বাচিত করে তাঁদের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। এই গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে শরীয়তে দুটি যোগ্যতার শর্তারোপ করা হয়েছে। এক. 'ফকীহ'– যিনি দ্বীন ও শরীয়তের উপর গভীর পাণ্ডিত্য রাখেন। দুই. 'আবিদ'– যিনি আল্লাহর ইবাদতগোজার বান্দা হবেন। এটা মূলতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঘোষিত মূলনীতি।

'মাজমাউজ জাওয়ায়েদ' গ্রন্থে হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে সহীহ সনদে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। সেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার তিরোধানের পর এমন মাসআলা উদ্ভূত হতে পারে, যে ব্যাপারে আপনার পক্ষ হতে কোন আদেশ বা নিষেধ কিছুই নেই। তখন আমরা কী করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যে তার কর্মপ্রক্রিয়া আমাদেরকে ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, شاوروا الفقهاء والعابدين, এমতাবস্থায় তোমরা এমন ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করো যারা ফকীহ, দ্বীনের গভীর জ্ঞান রাখে এবং আবেদ অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত গোজার। ولاتقضوا فيه رائ خاصة, আর এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষের মতামতকে এমনভাবে কার্যকর করো না, যেন এটাই সমগ্র উম্মতের পক্ষ হতে সম্মিলিত মত। ব্যক্তিগত মতামতের পরিবর্তে লোকদিগকে একত্রিত করে তাদের সাথে পরামর্শ করো। আর যে সব লোক থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হবে তাদের বৈশিষ্ট্যও তিনি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে তারা হবে ফুকাহা ও আবেদীন – এই দুই শ্রেণীর লোকদের নিয়ে পরামর্শ করো।

সুতরাং নির্বাচিত কমিটি এসব মূলনীতিগুলো সামনে রেখে যখন প্রয়োজন দেখা দেবে তখন দেশের উলামায়ে কিরামকে একত্রিত করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত গ্রহণ করবে এবং পরে সেই মতামত প্রকাশ করবে। তারপর অন্য আলেমগণেরও এর সমালোচনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। কোন ব্যক্তি তার বিপরীত কিছু বলতে চাইলেও বলতে পারবে। এভাবেই সম্মিলিত ইজতিহাদী কার্যক্রম তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে, যেমন করে চৌদ্দশ বছর ধরে চলে আসছে। পক্ষান্তরে তার জন্যে যদি আমরা

কোন কৃত্রিম মাধ্যম অবলম্বন করি তাহলে তার চলার সম্ভাবনা আমি দেখছি না।

সবশেষে আমি একটি কথা পেশ করব, সরকারের তত্ত্বধানে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান গঠন করার সময় একটি বিষয় অবশ্যাই মনে রাখতে হবে। যেহেতু সরকার পরিবর্তন হয় এবং লোকও পরিবর্তন হয়। তাই তার মূলনীতি এমন হতে হবে, যা সর্বাবস্থায় কার্যকরী থাকবে। এর জন্যে লোক নির্বাচনে রাজনৈতিক দৃষ্ঠিভঙ্গির পরিবর্তে খালেছ ইলম ও তাকওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। যে বিষয়ে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। অর্থাৎ 'ফকীহ' ও 'আবেদ' এর ভিত্তিতে এ নির্বাচন হওয়া দরকার। এটা যদি এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক ও সাংবিধানিক মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত হয় তাহলে ইজতিহাদের কার্যক্রম আমাদের জন্য ইনশাআল্লাহ রহমত স্বরূপ হবে। আমরাও এমন সব ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারব যেটা ইজতিহাদের ভুল ব্যবহারের দ্বারা আমাদের সমাজে সৃষ্টি হতে পারে। এই ব্যাখ্যাগুলো গ্রহণ সাপেক্ষ্যে আমি এই কমিটির পরামর্শের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি।

জিহাদ : আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক

(একটি চিঠি ও তার জবাব)

মুহতারাম জনাব মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী সাহেব (মাদ্দাঃ আলী)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু,

অধমের সম্প্রতি আপনার মাসিক 'আল বালাগ' এর কিছু পুরাতন সংখ্যা পড়ার সুযোগ হয়েছে। মুহাররম ১৩৯১ হিঃ (মার্চ ১৯৭১ইং) সংখ্যার দশম পৃষ্ঠায় ১৭ ও ১৮ নং ধারায় নিম্ন লিখিত বিষয়টি দেখতে পেলাম :

"(১৭) অমুসলিম রাষ্ট্রের যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শাক্রভাবাপন্ন নয় তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে।"

"(১৮) অন্য দেশের সাথে সম্পাদিত শরীয়ত সম্মত চুক্তিগুলো মেনে চলতে হবে। অন্যাবস্থায় চুক্তি শেষ করার ঘোষণা করতে হবে।"

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অমুসলিম রাষ্ট্র যদি শত্রুভাবাপন্ন না হয় বা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাহলে ইসলামী হুকুমত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা অমুসলিম হিসাবে স্বঅস্তিত্বে বিদ্যমান থাকতে পারবে। অর্থাৎ শক্তি স্বামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামী হুকুমত সেখানে আল্লাহর দ্বীনের প্রসারের জন্যে জিহাদ করবে না। যদিও অধমের মতে সেখানেও শান্তিপূর্ণভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আপনার বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়াই কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের শত্রু বলে গণ্য হওয়ার প্রকাশ্য দলিল। সুতরাং এই দুই দফার বিষয়বস্তুর সাথে অধমের পূর্ণ একাত্মতা রয়েছে। কেননা আমার দৃষ্টিভঙ্গি হল, মুসলমানদের মূল কাজ হলো সারা পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ। রাজ্য প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য নয় যে, পৃথিবী থেকে কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে সর্বত্র ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে (যেটি মওদুদী সাহেবের মতাদর্শ)। তবে শত্রু ও সন্ত্রাসী

অমুসলিম রাষ্ট্রের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রক্রিয়া হিসেবে (আক্রমণাত্মক জিহাদের মাধ্যমে) তাদেরকে পদানত করার চেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু রবিউস সানী ১৩৯১ হিঃ (১৯৮১ ইং) সংখ্যায় মাওলানা আব্দুশ শুকুর সাহেব লাখনুবী লিখিত 'সংক্ষিপ্ত সীরাতে নববী' গ্রন্থের পর্যালোচনা করতে গিয়ে ৭১ পৃষ্ঠায় ঐ গ্রন্থের নিম্ন লিখিত অংশ তুলে ধরেছেন ঃ

"জুলুমের হাত থেকে মজলুমকে বাঁচানোর জন্যেই কেবল জিহাদ বৈধ হয়েছে। অন্য কথায় স্বাধীনতা সংরক্ষণের নামই হল জিহাদ। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের জিহাদগুলোকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থা থেকে মুক্ত মনে করা শুধু ধর্মহীনতাই নয় বরং সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতাও।"

এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করে আপনি লিখেছেন, "এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধই জায়েয আছে। অথচ জিহাদের আসল উদ্দেশ্য এ'লায়ে কালিমাতিল্লাহ। যার অর্থ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরের প্রভাব খর্ব করা। এই উদ্দেশ্যের জন্যে আক্রমণাত্মক জিহাদ কেবল জায়েযই নয় বরং কখনো ওয়াজিবও হয়ে পড়ে। কুরআন সুন্নাহ ছাড়া পুরো ইসলামী ইতিহাস এই ধরণের যুদ্ধের ঘটনায় পরিপূর্ণ। অমুসলিমদের সমালোচনা করে কোন হীনমন্যতার শিকার হয়ে এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করা বা কৈফিয়ত মূলক-ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। নিঃসন্দেহে জোর করে কোন একজন লোককেও মুসলমান বানানো হয়নি এবং তার অনুমতিও নেই। অন্যথায় জিযিয়ার বিধানের কোন অর্থই থাকে না। তবে ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্যে তরবারী হাতে নেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি কুফর এর গোমরাহীতে ডুবে থাকতে চাইলে থাকবে। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্ট এই পৃথিবীতে বিধান চলবে আল্লাহরই। আর মুসলমান তাঁরই দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং তাঁরই বিদ্রোহীদের প্রভাব বলয় খর্ব করার জন্যে জিহাদ করে। এই বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে আমরা তাদের সামনে কেন কুণ্ঠিত হব, যাদের পুরো ইতিহাসই রাজ্য দখলের জন্যে রক্তপাতের ইতিহাস। যারা শুধু নিজেদের কামনার উদর পূর্তির জন্যে কোটি কোটি ইনসানকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়েছে।"

এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে জনাবের কাছে আমার দুটি নিবেদন। প্রথমত, মাওলানা আব্দুশ শুকুর লাখনুবী সাহেবের বাক্য হতে এই ব্যাখ্যা বের করা যে, তাঁর মতে শুধু আত্মরক্ষামূলক জিহাদ জায়েয আছে, আমার দৃষ্টিতে ঠিক নয়। যেখানে তিনি নিজেই লিখেছেন যে, 'স্বাধীনতা সংরক্ষণের নামই জিহাদ'। সুতরাং এর অধীনে যাবতীয় আক্রমণাত্মক জিহাদই শামিল হতে পারে। যেমন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (রহঃ) বলেন ঃ

"জিহাদ ইসলাম ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যে। তার অর্থ এই নয় যে, অগ্রগামী হয়ে যুদ্ধ করা যাবে না। অগ্রগামী হয়ে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যও ইসলাম ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ। তার কারণ, প্রভাব প্রতিপত্তি না থাকলে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পথকে রুদ্ধ করার জন্যে আক্রমনাত্মক জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোট কথা জিহাদের উদ্দেশ্য বস্তুত প্রতিহত করা – সেটা বর্তমান বাধাকে প্রতিহত করা এবং ভবিষ্যতে বাধাগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।" (আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ, খ. ৬ষ্ট মালফুজ নং ৪৯৭)

মাওলানা আব্দুশ শুকুর সাহেব অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বহু আক্রমণাত্মক জিহাদ সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি আক্রমনাত্মক জিহাদকে নাজায়েজ বলতে পারেন না। তবে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল জিহাদকে আত্মরক্ষামূলক বলেন। এটা সঠিকও বটে। কেননা, সেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য আরবের কাফেরদের শক্তিকে ধ্বংস করা – যাতে সত্য ধর্ম এই জনপদে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। সুতরাং এই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর মহান আল্লাহ বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে সূরা মায়দার ৩ নং আয়াতে ঘোষণা করেন ঃ

আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন (পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হওয়া) থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদের (কাফের)কে ভয় করো না (যে তোমাদের দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে) বরং আমাকে ভয় কর (অর্থাৎ আমার বিধানের বিরোধিতা করো না)। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (সকল দিক থেকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, (শক্তি-সামর্থ্যেও – যার

কারণে কাফেররা নিরাশ হয়েছে এবং বিধানেও) এবং (এই পূর্ণাঙ্গতার মাধ্যমে) আমি তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম (দ্বীনী বিষয়ে যেমন, আহকামের পরিপূর্ণতা এবং দুনিয়াবী বিষয়ে যেমন, শক্তি অর্জিত হওয়া)।

মোটকথা মাওলানা সাহেবও স্বাধীনতা সংরক্ষণের অধীনে অত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় প্রকার যুদ্ধই বুঝাতে চেয়েছেন। তারপরও যদি বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলতেন তাহলে ভাল হত। এতে পাঠকের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি হত না।

দ্বিতীয়ত, আপনার বিশ্লেষণের ব্যাপারে আমার নিজস্ব মতামত এজন্য ব্যক্ত করতে চাচ্ছি যাতে আমার মতামত ভুল কি শুদ্ধ সে সম্পর্কে আপনি আপনার মন্তব্য পেশ করেন। (ভুল হলে কুরআন ও সুন্নাহ্র দলিল জরুরী)। আমার মতামত নিম্ন লিখিত আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

আপনি অগ্রগামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন, এ'লায়ে কালিমাতিল্লাহ। আপনার মতে যার অর্থ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এবং কুফরের প্রাধান্যকে খর্ব করা। যাতে আল্লাহর সৃষ্ট পৃথিবীতে তাঁরই বিধান চলতে পারে। এই উদ্দেশ্যকে বুঝার জন্যে প্রথমে আমাদেরকে 'এ'লাউ কালিমাতিল্লাহ' এর অর্থ নির্ধারণ করা জরুরী। অধমের মতে সকল যুক্তিসঙ্গত, সত্য, সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কথাই কালিমাতুল্লাহ বা কালিমাতুল হক। তাকে সকল অযৌক্তিক, মিথ্যা, ভ্রান্ত ও অন্যায়ের উপর জয়যুক্ত করা অর্থাৎ মানুষের হৃদয়ে শেষোক্ত বিষয়ের কদর্যতা ও নিকৃষ্টতা এবং পূর্বোক্ত বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের বিশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করা এ'লায়ে কালিমাতুল হক বা কালিমাতুল্লাহ। কোন বস্তুর প্রাধান্য পাওয়ার অর্থ অধিকাংশের মাঝে সেই বস্তু সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান থাকা। যেমন, মুর্খতার প্রাধান্যের অর্থ জনসংখ্যার অধিকাংশের বিদ্যা থেকে অজ্ঞ থাকা। দুনিয়ার প্রাধান্যের অর্থ, মানুষ খুব বেশি দুনিয়ার ভালবাসায় মত্ত হয়ে পড়া এবং হারাম-হালালের কোন পরোয়া না করা। পাশ্চাত্যের প্রাধান্যের অর্থ, অধিকাংশ জনসাধারণের পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করা। হানাফিয়্যাতের প্রাধানের অর্থ, অধিকসংখ্যক মুসলমানের হানাফী হওয়া

ইত্যাদি। সুতরাং ইসলামের প্রাধান্যের অর্থ হবে অধিকসংখ্যক লোকের সঠিক অর্থে ইসলামের অনুসারী হওয়া। মূলতঃ ইসলামের এই (দ্বীনি) প্রাধান্যই কাম্য। যদি 'কালিমাতুল্লাহ' এর অর্থ 'ইসলাম' হয় তাহলে 'এ'লাউ কালিমাতিল্লাহ' এর অর্থ হবে ইসলামের ঐ প্রকারের প্রাধান্য, যেটা অর্জন করার পন্থা কার্যকরী দাওয়াত ও তাবলীগ এবং মুবাল্লিগ ও তার জাতির (অর্থাৎ মুসলমানদের) দৃষ্টান্তমূলক ইসলামী কর্মকান্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। এর দ্বারা অমুসলিমদের মন-মস্তিষ্কে বিপ্লব আসতে পারে। তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা বানিয়ে নিলে এই উদ্দেশ্য কখনো সফল হবে না। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে তাদের পরাজয়ের অনুভূতি দাওয়াত ও তাবলীগের আহবান শোনার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। অতএব আক্রমণাত্মক জিহাদের দ্বারা ইসলামের দ্বীনী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয় না বরং হয় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রাধান্য এবং তাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, ইসলামের নয়। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বতো হবে মুসলমান কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর পুরোপুরি আমলকারী হলে। রাজনৈতিক প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্যেতো তাদের ভাল মুসলমান হওয়াও তেমন জরুরী নয়। রাজনৈতিক প্রাধান্যের দ্বারা এই উদ্দেশ্যও লাভ হয় না যে, আল্লাহর সৃষ্ট পৃথিবীতে তাঁরই বিধান চলবে। কেননা অমুসলিমগণ জিযিয়া পরিশোধ করে প্রায় তাদের নিজস্ব জীবন প্রণালীর উপরই জীবনাতিবাহিত করে। মদ, শুকর তাদের জন্য হারাম হয় না। জিনাকারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা যায় না। তাদের বেলায় তাদের নিজস্ব বৈবাহিক নিয়ম-নীতি কার্যকর হবে। তাদের মূর্তিপূজাও চলবে বিনা বাধায়। এটাও বাস্তব যে, কোন কারণে যদি অমুসলিম প্রজাদের অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে এই রাজনৈতিক প্রাধান্য ততক্ষণই টিকে থাকবে যতক্ষণ ইসলামী হুকুমত শক্তিশালী থাকে। দুর্বল হলেই অমুসলিম প্রজারা বিদ্রোহ করবে এবং প্রয়োজনের তুলনায় প্রতিশোধটা আরো বেশি করে নিবে। যেমনটি ইসলামী হুকুমত শেষ হবার পর স্পেনে হয়েছিল বা হিন্দুস্তানে এখন হচ্ছে। যদিও এখানে ভারত পাকিস্তানের বিভাজনটাই ছিল মূল কারণ।

আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কোথাও আক্রমণাত্মক জিহাদ করা যাবে না। বরং শক্তি-সামর্থ্য থাকা অবস্থায় শত্রু ও সন্ত্রাসী ভাবাপন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রের উপর আক্রমণাত্মক জিহাদ ওয়াজিব (আরো বিভিন্ন অবস্থায় ওয়াজিব হতে পারে যার আলোচনার স্থান এটা নয়)। যাতে করে তাদের শক্তি খর্ব হয় এবং তারা ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগে বাঁধা দিতে না পারে। তবে মিত্র ও বন্ধু ভাবাপন্ন অমুসলিম রাষ্ট্র যারা তাদের দেশে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি দেয় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ উচিৎ নয়। বিশেষত আজকাল পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদকে অত্যন্ত খারাপ চোখে দেখা হয়। সেই যুগের কথা ভিন্ন যখন রাজ্যজয় ছিল সাধারণ রীতি এবং রাজা-বাদশাহ্দের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য হত এটা। আক্রমনাত্মক জিহাদের যে ঘটনাবলিতে ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ, সেগুলো ছিল সেই যুগের। তবে মুসলমানদেরকে সামরিক শক্তি ক্রমাগত বাড়াতে হবে যাতে অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধ দূরের কথা যুদ্ধের ভয়েই যেন সর্বদা আতঙ্কগ্রস্থ থাকে। শত্রুর মনে শঙ্কা সৃষ্টিকারী শক্তি সংগ্রহ করার নির্দেশ কুরআনেও রয়েছে। অতীতে রাজ্য জয়ের সাধারণ প্রথা চালু থাকলেও মুসলমানদের প্রাথমিক জয়গুলো অন্যান্য জাতির রাজ্য জয়ের থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। অন্যদের বিজয় অভিযান তো কেবল স্বীয় শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্যে এবং আপনার উক্তি অনুসারে কামনার উদর পুর্তি করার জন্যে পরিচালিত হত। তাদের উদ্দেশ্য পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য দখল বৈ কিছুই ছিল না। অথচ মুসলমানদের (আরব, ইরান, রোমের জিহাদগুলো বাদে যেখানে রাজ্য দখলও দরকার ছিল) প্রাথমিক বিজয়ের যুগে রাজ্য দখল উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এ'লায়ে কালিমাতিল্লাহ অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ (যার সর্বাধিক নিরাপদ রাস্তা ছিল তখন রাজ্য দখল)। হযরত কারী তৈয়্যব ছাহেব (রহঃ) বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম প্রকাশ্যেতো যুদ্ধই করতেন, কিন্তু তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এ'লায়ে কালিমাতিল্লাহ। তাঁদের উদ্দেশ্য যদি রাজ্য দখল করাই হত তাহলে তাঁরা এই শর্ত করতেন না যে, তোমরাই তোমাদের দেশ পরিচালনা কর, আমাদেরকে শুধু এতটুকু অনুমতি দাও যেন আমরা নিরাপদে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারি। লোকদেরকে আমরা আমাদের

কথা মানতে বাধ্য করব না। এ ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা থাকবে; ইচ্ছা হয় মানবে না হয় মানবে না। যারা এই শর্ত মেনে নিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। রাজ্য দখলের উদ্দেশ্য থাকলে এই শর্তের কোন প্রয়োজন ছিল না বরং তাদের দেশ তারা বিনা শর্তে দখল করে নিতেন। এ কারণেই যখন কোন অমুসলিম চুক্তিবদ্ধ বা জিম্মি হয়ে যায় তখন তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। কেননা আসল উদ্দেশ্য তো ছিল এ'লায়ে কালিমাতিল্লাহ এবং সেটা তাবলীগের সীমা পর্যন্ত।"

(কারী তৈয়্যব সাহেব আওর উন কি মাজালিস, প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৩৮)

আমার ধারণাগুলো স্পষ্ট করে জানালাম যাতে আপনার জবাব দিতে সহজ হয়। ওয়াচ্ছালাম

আপনার অনুগত

সাইয়্যেদ বদরুস সালাম

জনাব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

জিহাদ সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন তার সারসংক্ষেপ আমি বুঝেছি ঃ কোন অমুসলিম রাষ্ট্র যদি তাদের দেশে ইসলামের দাওয়াতের অনুমতি প্রদান করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েয নেই। আপনার উদ্দেশ্য তাই হলে তার সাথে আমি এক মত নই। ইসলামী তাবলীগের পথে বাধা শুধু এর নাম নয় যে, অমুসলিম রাষ্ট্র তাবলীগের উপর কোন আইনগত বিধি-নিষেধ আরোপ করবে।

বরং মুসলমানদের তুলনায় কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি-সামর্থ্যে সমৃদ্ধ হওয়াই সত্য দ্বীনের তাবলীগের পথে অনেক বড় বাধা। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে তাবলীগের উপর কোন আইনগত নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু পৃথিবীতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও দাপট বিদ্যমান রয়েছে। এই দাপট ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বিশ্বব্যাপী এমন এক মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে যেটা হককে গ্রহণ করার পথে তাবলীগের উপর আইনগত নিষেধাজ্ঞার চেয়েও অনেক বড় বাধা।

অতএব কাফেরদের এই দাপট খর্ব করা জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। যাতে এই দাপটের কারণে যে মানসিক ভীতি মানুষের মনে সৃষ্টি হয় সেটা ভেঙ্গে যায় এবং সত্যকে গ্রহণ করার পথ সুগম হয়। যত দিন এই দাপট ও প্রাধান্য অবশিষ্ট থাকবে ততদিন মানুষের মন তার দ্বারা প্রভাবিত হবেই। এবং সত্য দ্বীন কবুল করার জন্যে নিঃশঙ্ক চিত্তে উৎসাহিত হতে পারবে না। এই কারণে জিহাদ জারী থাকবে। কুরআনের ঘোষণা ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ সব লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না নত হয়ে করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।" (সূরা তাওবা ঃ ২৯)

এখানে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরগণ নত ও ছোট হয়ে জিযিয়া প্রদান না করে। জিহাদের উদ্দেশ্য যদি তাবলীগের জন্য আইনগত স্বাধীনতা লাভই হত তাহলে বলা হত, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাবলীগের অনুমতি না দেয়'। কিন্তু জিযিয়া ওয়াজিব করা এবং তার সাথে তাদের অধীনস্থ ও ছোট হওয়ার কথা - প্রমাণ করে যে, উদ্দেশ্য শুধু তাদের অহমিকা ও দাপটকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। যাতে কুফরের রাজনৈতিক প্রাধান্যের কারণে মানুষের মন-মস্তিষ্কের উপর যে শঙ্কার পর্দা পড়ে তা সরে যায় এবং ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্যের বিষয়ে মুক্ত মনে মানুষের চিন্তা করার সুযোগ হয়। ইমাম রাযী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره علي الكفر بل المقصود منها حقن دمه وإمهاله مدة رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة علي محاسن الإسلام وقوة دلائله فينتقل من الكفر إلي الإيمان فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام ويسمع دلائل صحته ويشاهد الذل والصغار في الكفر فالظاهر أنه يحمله ذلك علي الإنتقال الي الإسلام فهذا هو المقصود من شرع الجزية

অর্থাৎ জিযিয়ার উদ্দেশ্য, কাফেরদেরকে কুফরের উপর স্থায়ী রাখা নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের জীবনটা বাঁচিয়ে রেখে কিছু সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া এই আশায় যে, তারা ইসলামের সৌন্দর্য ও তার সত্যতার প্রমাণ পেয়ে কুফর থেকে ঈমানের দিকে ফিরে আসতে পারে। সুতরাং যখন কোন কাফেরকে একটি সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হবে, এই সময়ে সে ইসলামের মাহাত্ম্য অবলোকন করবে, তার সত্যতার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করবে এবং কুফরের লাঞ্ছনা দেখবে তখন এসব বিষয় তাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। মূলতঃ এটাই জিযিয়ার বিধানের উদ্দেশ্য।

আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরামের যুগে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে কি যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম অন্য দেশের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পূর্বে কোন তাবলীগী মিশন পাঠিয়েছেন? বা তারা তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে কি না তার অপেক্ষায় থেকেছেন? তাবলীগী মিশনকে কাজ করার অনুমতি প্রদানে অস্বীকার করায় কোন যুদ্ধ করা হয়েছে কি? রোমে আক্রমনের পূর্বে কি কোন তাবলীগী দল পাঠানো হয়েছিল? বা ইরানে হামলা করার আগে এমন ধরণের চেষ্টা করা হয়েছিল কি যে, জিহাদ ছাড়া শুধু তাবলীগের দ্বারা কাজ সমাধা হলে ভাল হয়? সত্য হল, না। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভ করার কোন উদ্দেশ্যই তাদের ছিল না। যদি উদ্দেশ্য কেবল এটুকুই হতো, তাহলে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মাত্র এই শর্তটি আরোপ করে যুদ্ধ বন্ধ করা যেত যে, মুসলমানদের তাবলীগের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করা যাবে না। কিন্তু অধমের অল্প-স্বল্প পড়া-শোনায় পুরো ইসলামী ইতিহাসে কোন একটি ঘটনা এমন ঘটেনি যেখানে এই শর্তটি মেনে নেয়ার উপর যুদ্ধ বন্ধ করার উৎসাহ প্রকাশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানগণ তাঁদের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছিলেন তাহল ঃ

وإخراج العباد من عبادة العباد إلي عبادة الله

অর্থাৎ "মানুষকে মনুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া।" (কামেল ইবনে আছীর পৃ ঃ ১৭৮ ২য় খন্ড)

অনুরূপভাবে কুরআন কারীমের ঘোষণা ঃ

وَقَاتِلُوْ هُمْ حَتّي لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ

"তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। (সূরা আনফাল ঃ ৩৯)"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) লিখেছেন ঃ

"দ্বীন অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য। তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ মুসলমান তাদের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে নিরাপদ না হয় এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম না হয়, যাতে অন্যদের উপদ্রপ থেকে মুসলমানদের নিরাপদ রাখতে পারে।"

তারপর বলেন, "সার কথা হল মুসলমানদেরকে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব যতক্ষণ মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচারের ফিত্না শেষ না হয়; এবং অন্য সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার না হয়। আর এই অবস্থা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হবে। সুতরাং জিহাদের নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। "

(মা'আরেফুল কুরআন, পৃ : ২৩৩ ৪র্থ খন্ড)

মোট কথা, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে জিহাদের উদ্দেশ্য কেবল তাবলীগের আইনগত স্বাধীনতা লাভ করা নয় বরং কাফেরদের শ্রেষ্ঠত্ব ধ্বংস করা এবং মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যাতে একদিকে মুসলমানদের উপর চোখ রাঙিয়ে তাকানোর সাহস কারো না হয়; অন্যদিকে কাফেরদের প্রভাবে দ্বিধাগ্রস্থ মানুষ শঙ্কা মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ মনে ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এটা প্রকৃতপক্ষে 'ইসলামকে সংরক্ষণের' উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। এই কারণে যে সব আলেম ইসলামের জিহাদকে আত্মরক্ষামূলক বলে ব্যাখ্যা করেছেন তারা এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই করেছেন। বস্তুত কুফরের প্রাধান্য খর্ব করে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা 'সংরক্ষণের' মৌলিক উপাদান। অতএব এই মৌলিক উপাদানকে তার থেকে পৃথক করা

যায় না। আমার ধারণা, পূর্ববর্তী উলামাগণ এটাকেই জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস ছাহেব কান্দলভী (রহঃ) বলেন ঃ

"জিহাদের নির্দেশ দ্বারা মহান আল্লাহর এই উদ্দেশ্য নয় যে, মুহূর্তের মধ্যে কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। বরং উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীতে বিচারক হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। মুসলমানগণ গৌরবের সাথে জীবন-যাপন করবে। এবং নিরাপদে আল্লাহর ইবাদত করতে পারবে। যাতে কাফেরদের পক্ষ হতে এরূপ কোন শঙ্কা না থাকে যে, তারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারে। ইসলাম তার শত্রুর অস্তিত্বের দুশমন নয় বরং তার প্রাধান্য ও প্রভূত্বের দুশমন যা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শঙ্কার কারণ হতে পারে।" (সীরাতে মুস্তফা, পৃ : ৩৮৮ ২য় খন্ড)

অন্য এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

"আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা

وَقَاتِلُوْ هُمْ حَتَّي لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ এর মাঝে ঐ ধরণের জিহাদ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ! তোমরা কাফেরদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ কর যতক্ষণ কুফরী ফিত্না নির্মূল না হয় আর আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। এই আয়াতে উল্লিখিত 'ফিত্না' অর্থ কুফরের শক্তি ও প্রাধান্যের ফিত্না। আর وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ অর্থ দ্বীনের ব্যাপক প্রসার ও শ্রেষ্ঠত্ব। অন্য এক আয়াতে রয়েছে لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّيْنِ كُلِّهِ অর্থাৎ দ্বীন এতটুকু শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি সঞ্চয় করবে যাতে কুফরের শক্তি দ্বারা পরাভূত হবার সম্ভাবনা না থাকে। এবং ইসলাম কুফরের ফিত্না হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হয়ে যায়।" (প্রাগুক্ত পৃ: ৩৮৬ ২য় খন্ড)

শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভের পর জিহাদের প্রয়োজনীয়তা যদি না থাকে তাহলে আজ দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে মুসলমানদের জন্যে তাবলীগের অনুমতি রয়েছে, (দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই অনুমতি কিছু মুসলিম রাষ্ট্রে নেই) অতএব এই মতানুসারে! এখন আর মুসলমানদের তরবারী ধরতে হবে না। সারা দুনিয়ায় কুফর তার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা উড়াতে থাকবে, সারা পৃথিবীর মানুষের উপর তার শৌর্য-বীর্যের প্রভাব বিস্তার করবে, পলিসি চলবে

তাদের, বিধান জারী হবে তাদের, তাদেরই আদর্শ প্রচার হবে, কার্যকর হবে তাদের পরিকল্পনা; আর মুসলমানগণ এই শান্ত্বনা নিয়ে বসে থাকবে যে, ঐ সব অমুসলিম দেশে আমাদের মুবাল্লিগ বা প্রচারকদের প্রবেশের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, যে দুনিয়ায় কুফর তার শৌর্য-বীর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, সেখানে আপনাকে তাবলীগের অনুমতি দেয়া হলেও কতজন লোক আপনার তাবলীগ মনোযোগ দিয়ে শোনার ও তার উপর চিন্তা করার জন্য প্রস্তুত ? যে মাটিতে রাজনৈতিক শক্তির বলে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী চিন্তা-চেতনা পূর্ণ শক্তিতে প্রচার করা হচ্ছে এবং তার প্রচার-প্রসারের জন্যে এমন সব উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে যা মুসলমানরা ব্যবহার করতে পারে না, সেখানে তাবলীগের অনুমতি লাভ করলেও তা কতটুকু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে ?

তবে যদি ইসলাম ও মুসলমানদের এমন শক্তি অর্জিত হয় যার মুকাবেলায় কাফেরদের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব পরাভূত হয় বা কমপক্ষে উপরে যে ফিত্নার আলোচনা করা হয়েছে তা সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে এই অবস্থায় অমুসলিম দেশের সাথে শান্তিপূর্ণ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে মিত্র সম্পর্ক রাখা জিহাদের পরিপন্থী নয়। এভাবে যতদিন পর্যন্ত কুফরের শ্রেষ্ঠত্ব ধ্বংস করার জন্যে প্রয়োজনীয় সামর্থ্য মুসলমানদের অর্জিত না হবে ততদিন শক্তি বৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করার সাথে সাথে অন্য দেশের সাথে শান্তিপূর্ণ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াও জায়েয। অর্থাৎ অমুসলিম দেশের সাথে দুই অবস্থায় চুক্তি হতে পারে।

(১) যে দেশগুলোর শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা মুসলমানদের শক্তি ও প্রাধান্য শঙ্কার মধ্যে না পড়ে তাদের সাথে মিত্রতা ও শান্তিপূর্ণ চুক্তি করা যেতে পারে যতদিন পুনরায় তারা মুসলমানদের শক্তি ও প্রাধান্যের জন্য শঙ্কার কারণ না হয়।

(২) মুসলমানদের কাছে তরবারীর মাধ্যমে জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে সামর্থ্য সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হওয়া যেতে পারে।

আপনি মুহররম ১৩৯১ হিজরীতে প্রকাশিত আল বালাগের যে লেখাটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানে এই ধরণের চুক্তির কথা বলা হয়েছে। আর

রবিউসসানী ১৩৯১হিজরীতে প্রকাশিত যে লেখাটি আপনি তুলে দিয়েছেন সেখানে ঐ ধরণের চুক্তির কথা বলা হয়েছে যখন কাফেরদের দাপট মুসলমানদের দাপটের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

সতুরাং আপনি যে লিখেছেন, "শত্রু ও সন্ত্রাসী ভাবাপন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামর্থ্য থাকা অবস্থায় আক্রমনাত্মক জিহাদ ওয়াজিব। যাতে তাদের শক্তি খর্ব হয় এবং ইসলামের তাবলীগের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। কিন্তু মিত্র ভাবাপন্ন অমুসলিম রাষ্ট্র - যারা তাদের দেশে তাবলীগের অনুমতি প্রদান করেছে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক জিহাদ উচিৎ নয়।" এর দ্বারা আমি উপরে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনি যদি তাই বুঝাতে চান, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি আপনার উদ্দেশ্য এটা হয় যে, শুধু তাবলীগের জন্য আইনগত অনুমতি দেওয়ার পর একটি অমুসলিম রাষ্ট্র 'মিত্র ও বন্ধু' হয়ে যায় এবং তাদের সাথে জিহাদ নাজায়েয হয়ে যায়, তাহলে আমার দৃষ্টিতে এ কথা সঠিক নয়। এর প্রমাণাদি উপরে আলোচনা করেছি।

আর আপনি যে বলেছেন, "বিশেষত আজকাল দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। সেই যুগের কথা ভিন্ন যখন বিজয় অভিযান ছিল সাধারণ প্রথা। রাজা-বাদশাহ্দের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণনা করা হত এগুলো। যে সব আক্রমণাত্মক জিহাদের ঘটনায় ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ তার সবই সেই যুগের।" এই কথার সাথে আমি কোনক্রমেই একমত নই। কারণ, এটাকে সত্য ধরে নিলে তার অর্থ দাঁড়াবে, কোন বস্তুর ভাল বা মন্দ সাব্যস্ত হবার জন্যে ইসলামের কোন নিজস্ব মাপকাঠি নাই। এবং কোন যুগে কোন খারাপ জিনিষকে সুন্দর বলে গণ্য করা হলে ইসলামও তার সাথে সূর মিলিয়ে দিবে আর যে যুগে মানুষ তাকে খারাপ মনে করতে থাকবে তখন ইসলাম ও তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করবে।

প্রশ্ন হচ্ছে 'আক্রমণাত্মক যুদ্ধ' একটি ভাল কাজ কী না ? যদি ভাল কাজ হয় তাহলে মুসলমানরা শুধু এর উপর ভিত্তি করে কেন বিরত থাকবে যে, 'আজকাল সাম্রাজ্যবাদকে পৃথিবীতে ঘৃণ্যার দৃষ্টিতে দেখা হয় ? আর যদি কাজটি ভাল না হয় বরং খারাপ হয়, তাহলে অতীতে ইসলাম এর থেকে

তাঁদেরকে কেন ফিরালো না ? তাঁরা কেন শুধু এর উপর স্থির থাকলেন যে, "এটা রাজা-বাদশাহ্দের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করা হত ?

আমার মতে ইসলামের আক্রমনাত্মক জিহাদগুলোর এহেন ব্যাখ্যা মারাত্মক ভুল ও বাস্তব ঘটনার অপব্যাখ্যা। মূল কথা সেই যুগেও কুফরের প্রভুত্ব ধ্বংস করার জন্যে জিহাদ করা হয়েছিল যখন এটা রাজা-বাদশাহ্দের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হত। কিন্তু এই জন্যে জিহাদ করা হয়নি যে, সে যুগে এটা সাধারণ প্রথা ছিল। বরং আল্লাহর দ্বীনের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে এটা বাস্তবিকই উত্তম কাজ ছিল। নইলে 'রাজা-বাদশাহ্দের বৈশিষ্ট্যের' মধ্যে এটাও গণ্য করা হত যে, তারা বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধের মাঝে কোন তারতম্য করত না। কিন্তু ইসলাম তৎকালীন সাধারণ প্রথার ভিত্তিতে এই ধরণের নিন্দনীয় কাজকে আমলে আনেনি। বরং যা-সে যুগের রাজা-বাদশাহ্দের কল্পনায়ও আসতে পারে না - যুদ্ধের এমন সব মূলনীতি ও আইন শুধু প্রণয়নই করেনি, তা বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছে। এমন কি ইসলামের আদর্শ যুদ্ধনীতি সেই সব মজলুম মানুষের কাছেও বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে, যারা রাজাদের অত্যাচারে শুধু অভ্যস্থই ছিল না বরং তাদের প্রশংসায়ও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

অতএব যে উদ্দেশ্যে অতীতে আক্রমনাত্মক জিহাদ জায়েয ছিল আজও সেই উদ্দেশ্যে জায়েয আছে। আর এ কথার উপর ভিত্তি করে তার বৈধতা অস্বীকার করা যাবে না যে, এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারকারী 'শান্তিপ্রিয়' লোকেরা আমাদের উপর 'সাম্রাজ্যবাদ' এর হাস্যকর মন্তব্য ছুঁড়ে দিবে। এবং ঐসব লোক নাক সিটকাবে, যাদের আরোপকৃত গোলামীর শৃঙ্খলে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির দেহ এখনো রক্তাক্ত।

এবং এটাও আমার কাছে কুফরী প্রাধান্যের কারণে সৃষ্ট ফাসাদ বলে মনে হয় যে, মানুষ ভাল-মন্দের মাপকাঠি বিশ্বব্যাপী এমন প্রপাগান্ডার ভিত্তিতে নির্ধারণ করে, যে তারা মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে মাথায় ঢুকিয়ে দেয়। আর এমনভাবেই ঢুকায় যে, অমুসলিম তো বটেই স্বয়ং মুসলমানরাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজ ধর্মীয় বিধানের কৈফিয়তমূলক ব্যাখ্যার পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়ে যায়। বাতিলের এমন দাপট খর্ব

করা যদি 'সাম্রাজ্যবাদের' সংজ্ঞায় পড়ে তাহলে এমন 'সাম্রাজ্যবাদের' অপবাদ পূর্ণ আস্থার সাথেই মাথা পেতে নেয়া উচিৎ। এটি উচিৎ নয় যে, আমরা অভিযোগকারীদের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বলব, 'হুজূর আপনারা যখন আক্রমনাত্মক জিহাদকে ভাল মনে করতেন আমরাও সেটাকে ভাল মনে করে তার উপর আমল করেছি। আর যখন থেকে আপনারা আপনাদের পুথি-পুস্তকে– এবং কেবল পুথি-পুস্তকেই- তাকে খারাপ বলতে শুরু করেছেন আমরাও তখন থেকে তা আমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি।"

এই চিন্তা ধারার সাথে একাত্মতা ঘোষণা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মুহাম্মদ তাকী উসমানী